মণিদীপা দাশ

অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য

B
891.448
D 26 A

B
891.448
D 26 A

অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য

মণিদীপা দাশ

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Abanindranath, Rabindranath O Anyanya
By Manidipa Das

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০১ 2001

Library IIAS, Shimla
B 891.448 D 26 A
00111853

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৬

B
891.448
D 26 A

© অসীমকুমার দাশ

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

Indian Institute of Advanced Study
Acc. No. 111853
Date 11/8/003
SHIMLA

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭৩

৫০ টাকা 50/-

আমার মা ও মেয়ে কে—
যাদের কিছু দিতে পারলে আমারই ভালো লাগে।

প্রাক্‌কথন

সবসময়েই চেয়েছি কিছু লিখতে। সে ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার পিছনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উজ্জীবনী' পাঠমালার ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। উক্ত পাঠমালায় যোগদানকারী প্রত্যেককে একটি ক'রে স্বরচিত প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল, আর সেগুলি সংকলিত হয়েছিল 'ভাবনা' নামের একটি পুস্তিকায়।

সেই-ই শুরু। তারপর যোগাযোগ হয় 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার কর্ণধার শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু-র সঙ্গে। নিয়মিতভাবে লেখার কাজ শুরু করি। বস্তুতঃ এই সংকলনের প্রথম সাতটি প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বসু আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা যে সাহিত্য-উপভোগের মাত্রা বাড়ায়, এ ধারণা জন্মেছিল এম. এ. পাঠকালে। পরবর্তীকালে মনে হয়েছে, যে, সাহিত্য সমালোচনার এই ধারাটি, এমনকি এই অর্থেও লাভজনক, যে, একটি বইয়ের সূত্রে অপর একটি বইয়ের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে। তারপরেও অবশ্য থেকে যায় ভাললাগা-মন্দলাগার দিক। এই সংকলনে সে বিষয়েও দুচার কথা বলেছি।

এই কাজে, আমার সহকর্মিনীরা আমাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। ভগ্নীপ্রতিম অধ্যাপিকা ড. মৌসুমী মল্লিকের সাহায্য ব্যতীত কাজটি সম্পূর্ণ হ'ত না—সে কথা অনস্বীকার্য। স্বামী ও পরিজনেরা সাহায্য করেছেন সাংসারিক দায়িত্বের ভার লাঘব করে—তবে তাঁদের সঙ্গে আমার ধন্যবাদের সম্পর্ক নয়।

বিভিন্ন সময়ের ভাবনার রূপ ধরা আছে এই সমালোচনা-প্রবন্ধগুলিতে। যদি সহৃদয় পাঠক সেগুলিতে আগ্রহী হন, তাহলে কৃতার্থ হব।

বেথুন কলেজ
১৭ই ভাদ্র, ১৪০৮

মণিদীপা দাশ

সূচীপত্র

অবনীন্দ্রনাথ : 'পথে বিপথে'র চিত্রশিল্পী	৯
চিত্রাঙ্গদা-রক্তকরবী-সে : তিন চিত্রশিল্পীর চোখে	২০
প্রকৃতির প্রতিশোধ—ভ্রান্তি ও উত্তরণের কাহিনী	২৮
বেদনাদীর্ণ মহাপ্রাণ : শরৎচন্দ্র	৩৯
ইতিহাস, সময় এবং জীবনানন্দ	৪৮
এক ভবঘুরে জাতকের কাহিনী	৫৪
অচিন্ত্যকুমার : ছোটগল্পের অপরিক্লান্ত শিল্পী	৬৫
'আশ্রয়'-এর সন্ধানে দুটি চরিত্র	৭৯

অবনীন্দ্রনাথ : 'পথে বিপথে'র চিত্রশিল্পী

'শিল্প' শব্দটি ছোটো, কিন্তু তার অর্থের পরিধি বিশাল। কত তার প্রকার, কত তার মাধ্যম, এবং কতই বা সেগুলির বিশিষ্টতা! তবে মূলত, সব শিল্পই এক। সব শিল্পীই চাইছেন বিশ্বের আনন্দের ছন্দকে নিজ নিজ সৃষ্টির ছন্দ দিয়ে স্পর্শ করতে। আর, এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যম ও প্রকরণ মিশ্রিত করতেও তাঁরা উদ্যোগী। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে, এই একই কারণে তুলি নামিয়ে রেখে কলম হাতে নিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

মাধ্যম থেকে মাধ্যমান্তরে যাবার সাধনা অবনীন্দ্রনাথের সারাজীবন ধরেই। বাড়িতে ছবি আঁকার রীতিমতো শিক্ষানবিশি করেছিলেন তিনি, আবার 'খামখেয়ালী সভা'র নিয়ম অনুযায়ী কলম তো ধরতেই হয়েছিল। একেবারে শেষ জীবনে সব ছেড়েছুড়ে মন দিয়েছিলেন কুটুম-কাটাম গড়ার কাজে। এ যেন অজরামর শিশুসত্তাময় অবন ঠাকুরের খেয়ালখুশি ; শিশুচিত্ত যেমন উচ্ছল আবেগে এক খেলা থেকে অন্য খেলায় নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো খেলায় পটুতা এসে গেলেই তাতে আর মন বসে না—ঠিক তেমনই। ছবি-আঁকা যখন নিতান্তই সহজ হয়ে গেল তাঁর কাছে, তখনই সমস্ত মনোযোগ সাহিত্যকে দান করলেন তিনি। এর একটা ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছিলেন পরে, বলেছিলেন—"শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হ'ল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা...।"[১]

এদিকে, এতদিনকার অভ্যস্ত চিত্রশিল্পের করণকৌশলগুলি মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যায় সাহিত্যের ভুবনেও। ফলে, ভারি চমৎকার একটা বিমিশ্রণ ঘটে এবং 'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে' এই ধারণাটাই প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর ধ্বনি শুধুমাত্র ব্যঞ্জনা নয়, চিত্রও সৃষ্টি করে, যেমন : "একটা আরাম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউগুলোতে কিছুমাত্র চঞ্চলতা নেই ; যেন ঘুমন্ত বুকের নিশ্বাসের মতো আস্তে উঠছে, আস্তে পড়ছে। সূর্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণচাঁপার মতো একটা স্থির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো ক'রে রয়েছে। তারই উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি।"[২]—এই ছবির মধ্য দিয়ে ঐ আরাম আর শান্তির ভাবটা কখন যেন বিছিয়ে যায় পাঠকের মনের ওপরে।

'পথে বিপথে'র প্রকাশকাল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ বছরে জাপানে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেছে—ছবিগুলি অবশ্য আগেকার আঁকা। 'পথে বিপথে'রও সব রচনাই (গমনাগমন ব্যতীত) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে 'ভারতী' পত্রিকার পাতায়। ১৯১৯-এর পরে ১৯২১ থেকে ১৯২৯ অবধি বাগীশ্বরী অধ্যাপক হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ; পরে, ১৯৩০-এ চিত্রাঙ্কন থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'পথে-বিপথে'র রচনাগুলি লেখার সময়ে চিত্র ও সাহিত্যচর্চা যুগপৎ চললেও, চিত্রচর্চার ধারাটি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে। তাঁর শিল্পীজীবনে, এ একটা স্তরের অবসানকাল, এবং ঐ সময়টাতে লেখা বলেই, এই বইটির মধ্যে তুলি আর কলম নিতান্ত কাছাকাছি এসে

পড়েছে; তাঁর ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে ভাষা নিয়ে খেলা করবার দক্ষতা (পরে যার পরিণতি দেখতে পাব তাঁর পুঁথিগুলির মধ্যে), নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে দুএকটি নতুন ধারণা (যা তিনি বলবেন রানী বাগীশ্বরী বক্তৃতামালায়)। এছাড়া, অন্য বইগুলিতে চিত্রশিল্পীসুলভ যে নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতেন তিনি—এখানে তা নেই, বরং হাজির আছে তাঁর দ্বিতীয় সত্তা—অবিন। এটা কিছু কম আকর্ষণীয় নয়। আর রয়েছে ছবির পর ছবি।

'পথে বিপথে'র গল্পগুলিতে যেমন আছে অনুভবের প্রাধান্য, তেমনই আছে ছবির প্রাচুর্য। কখনো কখনো সেই অনুভবও যেন একখানি বিমূর্ত ছবি—"...তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসত, আমার মনে হত, ওই ছবিখানার মধ্যে যে আছে, তারই যেন মাথাঘষার সুবাস পাচ্ছি।...নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামাপাখি। তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাস নীল আবরণে দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা, আর দুই বাহুর মধ্যে, বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি।"[৩] এই 'মোহিনী' গল্পটি হল এক চিত্রশিল্পীর স্বপ্ন ; একটি ছবিকে ভালোবাসার গল্প—যে ছবির বেশিটাই অন্ধকার শুধু দুখানি চোখ দৃশ্যমান—আর ঐ নয়নদুটির প্রেমেই অবিন আত্মহারা।

'গুরুজি' গল্পটির গুরুজি এক স্বেচ্ছাবিহারী চরিত্র, তিনি কোরান-পুরাণের কোনো চালু নিয়মের তোয়াক্কা করেন না—"তাঁর হাতের চিমটেয় তিনি তিনটে পাখির খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া বসনটা টুকরো টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা, পৈতের সূতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক ; লক্ষ্মীর ঘটটা উল্টে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন।"[৪] প্রথার উল্‌টোমুখে চলার এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথের নিজেরও ভারি পছন্দ—তিনি নিজেও ছবির মূল ভাবকে পরিস্ফুট করতে ইচ্ছেমতো ছবিকে জলে ভিজিয়েছেন, যাতে উজ্জ্বল বর্ণের স্তরবিন্যাসের ওপর স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ রঙের আচ্ছাদন খানিক মুছে যায়—পরে আবার রোদে শুকিয়েছেন—অসাধারণ tonal quality তৈরি হয়ে গেছে।

'পথে বিপথে'র অধিকাংশ কাহিনীতে চলমান স্টিমারের পটভূমি আছে। স্টিমার গতিময়, তাই স্টিমার থেকে দেখা দৃশ্যগুলিও গতিময়...দ্রষ্টার চোখে প্রতিটি ছবিই মুহূর্তেকের—পলে পলে সৃষ্ট হচ্ছে নব নব রূপ। 'দোশালা' গল্পে এই দেখছি রবাব বাজিয়ে কাবুলিওয়ালা 'স্লমিওসী পমঙ্গল' বলে গান ধরেছে, আবার এই দেখছি সেই অনবদ্য শালটি—যার একপিঠে আঁকা আছে বীণা হাতে এক অদ্ভুতদর্শনা বুড়ি, আর অন্যপিঠে এত অসাধারণ কারুকার্য যে মনে হয়, যেন ফুল ফুটে আছে।

সাধারণভাবে ছবি ফোটাবার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ প্রায় কোনো বিশেষ্যকেই বিশেষণহীন ক'রে ছেড়ে দেননি, যেমন :—'বাঁশির উপরে মিনের কাজ করা আধা-পাখি আধা-মানুষ একটি কিন্নরী বসানো হিমালয়ের দেবদারু-যষ্টি' অথবা 'বাঁকা-পায়া গোল-পিঠ, পাঁচরঙা ফুল-কাটা ছিট-মোড়া একখানা চৌকি'[৬], 'কালের চাপে পাটের গাঁটের মত নিরেট শক্ত বুক'[৭] ইত্যাদি।

চিত্রশিল্পের যে ছ'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বাৎস্যায়ন বলেছেন, তার প্রথমটি হল রূপভেদ।

সাহিত্যেও এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, রূপভেদ অর্থে রূপে রূপে বিভিন্নতা, যাকে পরিস্ফুট করতে হয় শব্দের মাধ্যমে। যেমন, রাত্রি সদ্য-বিগত, এই সময়কার আকাশের বর্ণনা :—

"আকাশের নীল চোখে সরু-একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি অরুণ আভা দেখা যাচ্ছে।"[৮]

আবার, আর একটু পরের আকাশের চেহারা—"কাঁচা সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত-বাউরির বুকের পালকের অফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হ'য়ে গেল।"[৯]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রমা, যার অর্থ ভ্রমবিহীন জ্ঞান। শব্দের সাহায্যে এমন ইঙ্গিত দিতে হয়, যে অল্প বলা হলেই, বাকি অংশটাও সঠিকভাবে ব্যঞ্জিত হয়ে যায়। যেমন—"এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই। পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যামসুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া। ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশশত শিল্পীর মানসশতদল—সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।"[১০] বিশাল কোণার্ক মন্দিরের কথা এই ক্ষুদ্র স্তবকের স্বল্পপরিসরে ভ্রমবিহীনভাবে ধরা পড়েছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ভাব, যার কাজ হ'ল বিষয়টির আকৃতি-প্রকৃতি-স্বভাবকে ব্যঞ্জিত করা। যেমন :—"একটি সাদা পাখি ঢেউয়ের উপর, পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়িটির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।"[১১] পাখিটি যে কত অসহায়-নরম এবং কোমল, ঢেউয়ের বিপক্ষে যাবার পথে কত অনুপযুক্ত এবং আত্মনিয়ন্ত্রণহীন, তা-ই এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য লাবণ্য-র কাজ ব্যঞ্জনে লবণের তুল্য—স্বল্পতায় দোষ, আধিক্যেও দোষ। এককথায় পরিমিতি-ই হল লাবণ্যের বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যে এ পরিমিতি বোধের নিদর্শন রেখেছেন অবনীন্দ্রনাথ :—"দিন এখানে আসছে উত্তাপহীন, অনুজ্জ্বল; রাত আসছে অঞ্জনশিখার মতো হিম, অন্ধকার।.....আমাদের কাছে চারিদিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রঙ-তুলির কাজ শুরু করেন নি—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্বত্যদৃশ্যের আমেজ একটু একটু দেগে রেখেছেন, অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।"[১২] পর্বতে কুয়াশার রাজত্ব—তদ্বিষয়ক অনুভবের পরিমিত বর্ণনা এটি।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য সাহিত্যে প্রকাশ পায় নানাপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহারের মাধ্যমে—আর এর সাহায্যে কত না-বলা-কথাও ব্যক্ত হয়ে যায়। ছবি তো ফুটে ওঠেই। সাদৃশ্য ব্যবহারে অবনীন্দ্রনাথ খুবই উদার:—"বারাণসী—মন্দির-মঠের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য!"[১৩] অথবা, "নির্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মত চুপ ক'রে পড়ে আছে...।"[১৪] তাঁর রচনায় উপমা এবং তীক্ষ্ণ বর্ণানুভূতি কখনো কখনো একত্রে মিশে গেছে—

"সেখানে কী আশ্চর্য পাখিরাই ঘুরে বেড়াচ্ছে! রঙিন পালকের আলোতে সেদিকটা কখনো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার মত নীল, কখনো সকালের আকাশের মত সোনালি, সন্ধ্যার

আকাশের মত রাঙা, জলের মত ঝকঝকে রূপালি, ধানের খেতের মত ঠাণ্ডা সবুজ।"[১৫]

পরিপ্রেক্ষিতের বোধ চিত্রকলার ক্ষেত্রে খুব জরুরি। এর মূল কাজটা হ'ল নিকটের ও দূরের বস্তু এবং তলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা। একই দৃষ্টির সূত্রে সবগুলি বিধৃত হয়। কেন্দ্রাপসারী বা বিহঙ্গবীক্ষণ পরিপ্রেক্ষিতে দূরের দৃষ্ট বস্তু সম্মুখের বস্তুর আকৃতি থেকে সর্বদা বড় হয়—আর উল্টোটা হয় কেন্দ্রাভিসারী পরিপ্রেক্ষিতে। সাহিত্যেও এমত প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন 'পথে বিপথে' থেকে একটি নমুনা—

"দূরে দেখা যাচ্ছে, বালির চড়ার উপরে গোটাকতক নৌকো কাত হয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে সবুজ একটা আকের ক্ষেত ; তার পিছনে একটা কলের চিমনি থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে ; একটা শঙ্খচিল নীল আকাশ থেকে আস্তে আস্তে জলের দিকে নামছে।"[১৬]

কেন্দ্রাভিসারী পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনীয় বস্তুগুলি দুপাশ থেকে ক্রমশ একটি লক্ষ্যের দিকে যেতে যেতে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এখানেও প্রথমে দৃষ্টি ছড়িয়ে যাচ্ছে দুপাশে, 'বালির চড়া, গোটাকতক নৌকা'—ক্রমশ দৃষ্টি দুপাশ থেকে সরে এসে দূরের দিকে প্রসারিত হচ্ছে, তাই নজরে পড়ছে সবুজ আখের খেত, কলের চিমনি ও ধোঁয়া। একেবারে শেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে একটি বিন্দুতে—একটা শঙ্খচিল জলে নামছে।

অনেকসময় বর্ণ-পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারাও নিকট ও দূরকে একসূত্রে গাঁথা হয়। নিকট থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, বর্ণপ্রয়োগ ততই গাঢ় থেকে ফিকে হতে থাকে। এক্ষেত্রে, রঙ প্রয়োগ ক'রে নিকট ও দূরের বিভিন্ন মাত্রা বোঝানো যায়। সাহিত্যে রঙ প্রযুক্ত হতে পারে শব্দপ্রয়োগের দ্বারা, যেমন :—"তীরের আলোগুলো কালো জলের গায়ে সাপ-খেলানো সোনার এক একটা রেখা টেনে দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হ'য়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে।"[১৭]—তীরের কাছে যে নদী, তাতে তীরের আলোগুলির প্রতিফলন ঘটছে। আর নদী যত দূরে গেছে, ততই নদী ঐ আলোর অভাবে কালো আর অন্ধকার—ফলে নদী ও আকাশের ভেদরেখাটা দেখা যাচ্ছে না।

চিত্রকলার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বর্ণের ঐকতান—অর্থাৎ সর্বার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণবিন্যাস। চিত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভাবগত সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে কোনো একটি রঙকে প্রাধান্য দিয়ে তার সঙ্গে অন্যান্য রঙ প্রয়োগ করা হয় সংযোজন ও বিয়োজন নীতি অনুযায়ী। ব্যাপারটা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটলে রঙের texture বা বুনুনি তৈরি হয়। রঙ প্রয়োগের ব্যাপারে চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দক্ষতা ছিল। পরবর্তীকালের চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী ঐ দক্ষতা সম্পর্কে বলেছেন—"অসাধারণ বললে কম বলা হয়, অবিশ্বাস্য। ওনার ক্ষমতা ছিল High Class.—শিল্পী তাঁর নিজের ছবিতে স্বচ্ছ রঙের আচ্ছাদন দিয়ে নতুন ভাব সৃষ্টি করতেন।"[১৮] এই প্রশংসাযোগ্য দক্ষতা সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে 'আলোর ফুলকি'তে একটি অনবদ্য বর্ণনা আছে। কুঁকড়োর চার বউয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে, স্বল্প পরিসরে রঙের ঘূর্ণি জাগিয়ে দিয়েছেন তিনি—"সাদি, মেমসাহেবের মত গোলাপি ফিতে মাথায় বেঁধে ঘাগরা পরে ঘুরঘুর করছেন ; কালি, চোখে কাজল আর নীলাম্বরী শাড়ি পরা, মাথায় সোনালী মোড়া খোঁপা, যেন কালতে

ঠাকরুণ ; সুরকি, তিনি ঠোঁটে আলতা দিয়ে, গোলাপি শাড়ি পরে যেন কনে বউটি ; আর খাকি, তিনি ধূপছায়া রঙের সায়া জড়িয়ে বসে রয়েছেন, যেন একটি আয়া।"[১৯] সব মুরগিই পৃথক পৃথক বর্ণের পোশাক পরেছে, কিন্তু রামধনুর মতোই একত্র অবস্থানে সবগুলিই সুসমঞ্জস। 'পথে বিপথে'র কাহিনীগুলির মূল ভাবকে সঙ্গী করলে, এত বর্ণিল হবার সুযোগ বেশি পাওয়া যায় না ; তবে সাদা / কালো—এসব বর্ণও ঐকতান সৃষ্টি করতে পারে, যেমন :—"তখন আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মত সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টলটল করছে....।"[২০] কী অসাধারণ উপমা ভোরের আলো-র! সে আলো বেলফুলের মতই কোমল, পেলব লাবণ্যে ভরা।

বর্ণ-প্রসঙ্গে বর্ণের সুরের কথাও এসে পড়ে। মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির সঙ্গে রঙ সুপ্তভাবে বিজড়িত থেকে তাকে বিভিন্ন ভাবপথে পরিচালিত করে। হলদে-সাদা-গেরুয়া সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশক, রক্তলাল বা গাঢ় সবুজ দ্বেষ-দম্ভ-অহঙ্কার প্রকাশ করে—এইরকম বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের একটা আন্তর-সাম্য থাকে। এটা কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নয়, কিন্তু এক একটি বর্ণের প্রতি মানবমনের যে স্বাভাবিক অনুভূতি—দক্ষ শিল্পী কখনো তার বিরোধিতা করেন না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা। যেমন :—"একটি সাদা পাখি ঢেউয়ের উপর পদ্ম থেকে পাপড়িটির মত ভেসে বেড়াচ্ছে।"[২১]—সাদা রঙ পবিত্রতার দ্যোতক, আর পুষ্প সর্বদাই নিষ্কলুষ। তাই সাদা পাখিটি এবং ছিন্ন পদ্মপর্ণের মধ্যে লেখক সাম্য খুঁজে পেয়েছেন। সাদা রঙের মধ্যে কোমলতারও একটি ইঙ্গিত আছে। যেমন :— "মীরসাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখির বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠছে।"[২২]—পাখির বুকের পালকের যে কোমলতা, ঐ হাল্কা সাদা ধোঁয়া যেন তেমনই নরম আর কোমল ; তীব্র শ্বাসরোধী আবহ নয়। শুধু এইটুকুই নয়, আরো মনে হচ্ছে যে—ঐ জাহাজটিই যেন একটি কোমল পাখি, যে তার বুকের উষ্ণতার মধ্যে ঠাঁই দিয়েছে মীরসাহেব এবং একটি অনাথ ছেলেকে—যে ছেলেটি একদিন ঐভাবেই মীরসাহেবের বুকে আশ্রয় পেয়েছিল। এই কোমল-কাহিনীর সঙ্গে মৃদু ও নরম সাদা বর্ণই সাযুজ্যময়।

বর্ণ বিষয়ে সব মানুষেরই সাধারণভাবে কিছুটা বোধ থাকে, এবং থাকে বলেই বর্ণের সামঞ্জস্য, বৈপরীত্য, বর্ণের মূল ভাব—এসব ব্যাপার মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় খানিকটা স্থান অধিকার ক'রে থাকে। এই প্রাথমিক বর্ণবোধের তুলনায় চিত্রশিল্পীর বর্ণচেতনা উচ্চস্তরীয়। তাই যে আলোকে সাধারণ লোকে হলুদ দেখে, তিনি তাকে দেখেন লালচে হলুদ। এই দেখার চোখটাই শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশেষ অর্জন। এই ধরনের অর্জিত সম্পদের কিছু দৃষ্টান্ত :—

১) "আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে গায়ে *মধুপিঙ্গল আলো* পড়েছে...."[২৩]

২) "সূর্যাস্তের নিচে *সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার* চিরে নদী একটি রূপোর তারের মত দেখা যায়।"[২৪]

৩) "...জলের ফেনা যেন ফুলের *সাদা সাজ*।"[২৫]

৪) "...বসন্ত বাউরির বুকের পালকের *অস্ফুট বাসন্তী আভা*...."[২৬]

আসলে, অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, রঙের মধ্যে দিয়ে ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। তিনি বলতেন—"শরতের নীল আকাশে রোদ্দুর দেখলে, তাতে একটু রঙের ওয়াশ দিয়ে দাও, হয়ে যাবে বাদ্‌লা দিন। আবার একটু কালোর ওয়াশ দাও, আকাশ ফুটে উঠবে।"[২৭] বর্ণপ্রয়োগের আরো নানাপ্রকার ব্যাখ্যা ছিল তাঁর কাছে, যেমন, নীল রঙ পিছিয়ে দেয়, লাল রঙ এগিয়ে আনে, গ্রীনের পাশে ব্রাউন দিলে গ্রীনের জেল্লা খোলে...ইত্যাদি।

বিন্যাসের নতুনত্ব এবং ত্রিমাত্রিকতার ধারণা দিতে হয় চিত্রশিল্পীকে, তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে, যেটি স্রষ্টার ধারণার প্রধান বিষয়, সেটির ওপরে তিনি জোর দেন এবং অন্য বিষয়গুলি হয়ে ওঠে সহায়ক। প্রধান বিষয়টিই রসের কেন্দ্র। সাহিত্যেও এইভাবে প্রধান ও অপ্রধান বিষয়-বিন্যাসে রসকেন্দ্র চিহ্নিত করার চেষ্টা আছে অবনীন্দ্রনাথে, যেমন :—"আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা ঐ সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটরাণী, আমার এক সতীন আছে।"[২৮] —সতীন থাকাটা সাতমহলা প্রাসাদ বা সাতশো দাসীর তুল্য নয়, বরং আলাদা। কারণ সতীন আছে বলেই বাড়ি-দাসী-অলঙ্কার-প্রাসাদ থেকেও নেই। ঐ শেষ বাক্যটিই এই স্তবকের রসকেন্দ্র, তবে বিপরীতার্থক। অন্য প্রকার রসকেন্দ্রও আছে, যেমন :—"জাহাজ আজ ঘুমন্ত হাঁস ; যেন ডানার ভিতরে মুখ গুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওভারকোটের কলারটা দুই কানের উপরে বেশ করে টেনে দিয়ে বসে রয়েছি। বাদলার দিনে স্কুলের খালি বেঞ্চিখানায় বসে যেমন, ঠিক তেমনি আজ মনে হচ্ছে, গাড়ি পাই তো পালাই। এমন সময় সামনের কুয়াশার ভেতর থেকে শুনলুম কচি গলায় কে ডাকলে, 'মা'!"[২৯] —এই শেষ বাক্যটি স্তবকের বাকি অংশের তুলনায় একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কোথাও মানুষজন নেই, প্রবল ঠাণ্ডায় শরীরের সঙ্গে অনুভূতিও আড়ষ্ট, মনের মধ্যে পালাই পালাই ভাব, এমন সময় এই উষ্ণ ডাকটি কানে পৌঁছে মনের বরফ গলিয়ে দিল। তাই পরের স্তবকেই লেখক বলছেন—"এরই মধ্যে কচিগলার সেই 'মা' শব্দ, সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল, তা কি আর বলতে হবে।"[৩০]

চিত্র দ্বিমাত্রিক, কিন্তু বর্ণ বা আলোছায়া প্রয়োগ বা অন্য কোনো কৌশলের দ্বারা ত্রিমাত্রিকতার বোধটি চিত্রে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। সাহিত্যে শব্দপ্রয়োগের সাহায্যেই ঐ বোধটি জাগাতে হয়। যেমন :—"স্বর্ণচাপার মতো একটি স্থির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো করে রয়েছে। তারই উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি।"[৩১]—এখানে আকাশ-তীর এবং দ্রষ্টার অবস্থান এই তিনটি বুঝিয়ে দিয়ে, ত্রিমাত্রিকতার বোধ আনা হচ্ছে।

বর্ণপ্রয়োগ বিষয়ে ইম্প্রেশনিজম্ আন্দোলনের কথা এসে যায়—যে আন্দোলনের মূল কথা এই, যে একই বস্তু দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোতে বিভিন্নরকম হয়ে ওঠে। তাই সব বস্তুই প্রতিমুহূর্তে নব-নব রূপে প্রেক্ষকের সামনে প্রতিভাত হয়। ধরা যাক, বস্তু হল নদীর জল, এবং আলোক-উৎস হল সূর্য। সেক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে ঐ একই বস্তু কীভাবে রূপবদল করে, একটি সারণির মাধ্যমে তা দেখা যাক :—

কাহিনীর নাম	বস্তু	আলোক-উৎস	সময়	বস্তুর রূপবদল
১. সিন্ধুতীরে	নদীর জল	সূর্য	সূর্যোদয় মুহূর্ত	জল যেন রক্তবৃষ্টিতে রাঙানো।
২. মোহিনী	নদীর জল	সূর্য	প্রত্যূষ	বেলফুলের মত সাদা আলোয় পূর্ণ।
৩. নিষ্ক্রমণ	নদীর জল	সূর্য	দ্বিপ্রহর	বিজলীরেখার মতো।
৪. নিষ্ক্রমণ	নদীর জল	সূর্য	দিনান্তবেলা	রুপোর তারের মতো।

এমন উদাহরণ 'পথে বিপথে' গ্রন্থে প্রভূতমাত্রায় আছে। প্রসঙ্গত একস্‌প্রেশনিজম বা প্রকাশবাদেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন বিজ্ঞানের সকল শাখায় নব নব আবিষ্কার হতে লাগল এবং ঐ নব্যবিজ্ঞান বুঝিয়ে দিল যে, আমাদের চোখে দেখা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-জগৎ, আসল জগৎ নয়—আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনা দিয়ে আমরা জগতকে আংশিক তথা খণ্ডিতভাবে (ফলত বিকৃতভাবে) পাই। তখন প্রকাশবাদী শিল্পে নেপথ্যের ঐ আসল পৃথিবীকে পাবার জন্য পথ খোঁজা শুরু হল। চিত্রে এর দুরকম প্রভাব দেখা দিল। প্রথমত, শিল্পীর নিজস্ব আবেগের প্রকাশ দেখা গেল। দ্বিতীয়ত, শিল্পীও প্রাণপণে নিজের অহং-কে সঙ্কুচিত ক'রে প্রকৃতির শুদ্ধ তথা অপরিবর্তিত রূপকেই ফোটাতে চাইলেন। ভাষা রাজ্যেও প্রকাশবাদের এই মূল ধারণাটি প্রবেশ করল। অনেক বাংলা শব্দ, যা আগে ছিল 'দেশী' শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত, সেগুলি অবাধে সাহিত্যে প্রবেশ করল, কারণ ঐ শব্দগুলি শিল্পীর মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এ জাতীয় শব্দ অনেক আছে। কত ইঙ্গিতবাহী অনুকার শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি, যেমন—'মাথাটা *কিটকিটে* ময়লা পাগড়িতে ঢাকা' 'ভোরের অন্ধকার *টলটল* করছে' '*চোঁ চোঁ* চম্পট' '*ঝমাঝম* বাদলা' ইত্যাদি। এ হল শুধু শব্দের কথা। গূঢ় অনুভূতির অভিঘাতে, প্রবল আবেগের ধাক্কায় ভাষা যখন কেঁপে ওঠে, বহুদূরে চলে যায় তার পরিচিত অভিধাকে ছাড়িয়ে, তখনই ভাষার মধ্যে প্রকাশবাদ জন্ম নেয়। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় এমন উদাহরণও আছে—"আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল অন্ধকারের দিকে মুখ করে।"[৩২] —এই সন্ধ্যাটি যে শীতার্ত এবং হরিণের মতো ভীত এই ভাবটি প্রকাশ পেল। 'ভীত'—কারণ ঐ অন্ধকারের কালিমা প্রায় নীরন্ধ্র। অপর একটি উদাহরণ : "সূর্য লুকিয়ে গেছেন ; জল থেকে উঠছে কুয়াশা ; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার ; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়।"[৩৩]—পৃথিবীতে আঁধার নামছে, আঁধার নামছে মনেও—সেইটিই এখানে প্রকাশিতব্য অনুভব।

চিত্রের নেপথ্যে থাকতে হয় বলেই, চিত্রের মধ্যে অনেকখানি হৃদয়ানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার করণকৌশল চিত্রশিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ ; অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই, আর তার ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মেও ঐ স্বভাবসিদ্ধ কৌশল এনে দিয়েছে নূতন মাত্রা। 'অস্থি' গল্পের চকচকে কালো ইরানি টুপি, টুপির চেয়ে কালো ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁফ, চামড়ার পুস্তিন এবং সোনা বাঁধানো গেঁটে বাঁশের লাঠিতে শোভিত মানুষটির কথা ধরা যাক, যার ইংরেজি অতি বিশুদ্ধ এবং যে তার জাহাজখানি পোর্ট কমিশনারকে বিক্রি ক'রে ফেলেও সেটির মায়া কাটাতে না পেরে নিত্য জাহাজ-ভ্রমণ করে। হীরেয় মোড়া তার ঘড়ির চেনের সমস্তটা পান্না আর চুনি দিয়ে গাঁথা। সেই ঘড়ি আর চেন দু' আঙুলে ঘুরাতে ঘুরাতে গঙ্গার দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে লোকটা বিড় বিড় ক'রে বকে। এই বর্ণনায় ঐ

ভদ্রলোকের মনের একটা দিশা পাওয়া যায়। যে দিশা আরো স্পষ্ট হয়, যখন অবিন লোকটার হাত থেকে ঘড়ি ও চেন কেড়ে নিয়ে নিজের পকেটে পোরে এবং "সেই লোকটা একটু নড়ল না, চড়ল না, অবিনের দিকে ফিরেও দেখলে না, উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যেমন ছিল তেমনি রইল ; আর দেখলেম, তার দুটো আঙুল ঘড়ি চেনটা নিয়ে যেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে আস্তে শূন্যে ঘুরছে।"[৩৪] স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অতি প্রিয় জাহাজটির বিরহ তাকে বহির্জাগতিক সবকিছুতে উদাসীন ক'রে তুলেছে, এমনকি তার আঙুল যে পূর্ব্ববৎ ঘুরছে, তার মন তা জানে না।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বিভিন্নপ্রকার 'image' বা বাক্‌প্রতিমা ব্যবহার করেছেন। মানুষের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। উক্ত শিল্পীর রচনায় প্রাপ্ত বাক্‌প্রতিমার দুটি উদাহরণ : "তারপর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবাবের ছেঁড়া তারে টঙ্কার শুনতে পাচ্ছি—।"[৩৫] অথবা, "সুর যেমন গিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করলে অমনি মনে হ'ল যেন রাত্রির নীল পর্দা খুলে দলে দলে তারা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, জলের শব্দ এতক্ষণ কানে আসেনি কিন্তু এখন যেন শুনি জলও ওই সুরে, বাতাসও সেই সুরে তাল দিচ্ছে ; আর মনে হল, রাত্রির রঙ ক্রমে যেন পাতলা হয়ে আসছে।"[৩৬] এই দুটি উদাহরণে পাওয়া গেল ধ্বনিরূপপ্রবল বাক্‌প্রতিমা যেখানে কল্পনার প্রধান অবলম্বন কর্ণের ইন্দ্রিয়বেদিতায় বিধৃত। আবার চক্ষুনির্ভর বাক্‌প্রতিমা এইরকম—"আমি সেই ছোকরার কথায় নদীর পশ্চিমদিকে চেয়ে দেখলেম পৃথিবীর মাথার উপর থেকে সেই লাল মখমলের বড়ো টুপিটা সরে গেছে, দিগন্তের শিয়রে কালো মেঘ এসে লেগেছে, আর নদীর পূর্বপারে চাঁদনী রাতের নতুন জ্যোৎস্না—।"[৩৭] এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে অন্য ইন্দ্রিয়জ ধারণায় গড়িয়ে পড়া বা synaesthesia-ও একপ্রকার বাক্‌প্রতিমা। যদি বলি, 'তোমার গান শুনে অঙ্গ শীতল হ'ল'—অর্থাৎ যা শুনলাম, তা যেন আমার স্পর্শে এল—তখন synaesthesia সৃষ্টি হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :—"পাথর বাজিতেছে—মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যামসুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া।"[৩৮] পাথর স্পর্শমাত্রে যে শীতল কাঠিন্যের এবং অনড়তার অনুভব হয়, তা এখানে নেই। এখানে পাথর তেজীয়ান অশ্বের মতো সচল, এখানে পাথরের মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বর শোনা যায় (কর্ণেন্দ্রিয়র প্রাধান্য), এখানে উর্বর পাথর ফুলের মতো ফুটে ওঠে।

অনেকসময় Chain-imagery-ও দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে একটা বাক্‌প্রতিমার সূত্র ধরে পরবর্তী বাক্‌প্রতিমা আসে। যেমন : "একটা ঝড় যেন প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিয়ে আমার ভিতরে জমাট বাঁধা কাজকে হঠাৎ ঠেলে বার ক'রে দিলে। আমার পাঁজরের সমস্ত হাড়গুলো তল্‌তা বাঁশের বাঁশীর মতো করুণ সুরে সহসা বেজে উঠল আর আমার সেই মরা মায়ের ডান হাত আস্তে আস্তে তাঁর নিজের বুকের উপর থেকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আস্তে আস্তে আপনার মুঠো খুললে।"[৩৯]

এখানে মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে বেগবান ঝড়ের সাযুজ্যসাধন করেই কবিকল্পনা ধাবিত হয়েছে অন্য সাযুজ্যে। জমাট বাঁধা কাজ হচ্ছে আবর্জনা, যাকে ওই ঝড় ঠেলে বার ক'রে

দিল। ফলে, যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, তার থেকে জন্ম নিল তল্‌তা বাঁশের বাঁশির করুণ সুর। এ কারুণ্য মায়ের মৃত্যুর শোকজনিত। সে শোকের আরো খুঁটিনাটি প্রতিমা তৈরি হল—'পাঁজরের হাড়গুলো যেন বেজে উঠল।' ওই কান্না মা ও ছেলের হৃদয়ের মধ্যে এই প্রথম সংযোগসাধন করল—তাই মৃতা মায়ের ডান হাতটি তাঁর বুক থেকে লেখকের বুকের ওপরে এসে তার মুঠো খুলল।

'পথে বিপথে' গ্রন্থে অনেকসময়ই অবনীন্দ্রনাথ এমনতর ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা শুনলে মনে হয়, সেগুলি যেন ভাষান্তরে ছবি আঁকার এক একটি নির্দেশ। 'বসন্ত বাউরির সবে-ওঠা কচি ডানার মতো হলদে রোদ' 'অমাবস্যার রাতে তারার জুঁই ফুলে সাজানো নীল আকাশের নীচে' 'কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার' 'পশ্চিমদিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটি নির্ঝর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে ; রাতের পাখি এরই উপর দিয়ে কালো ডানা মেলে উড়ে আসছে' এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। এই ধরনের চিত্রল বর্ণনার প্রবণতা অতি চমৎকার রূপ পেয়েছে একটি অসাধারণ ছবির মধ্যে : "রঙের খেলার সেখানে অন্ত নেই। তারই মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একদল শিশু, পাখির ঝরা পালক উড়িয়ে উড়িয়ে ছড়াছড়ি করে তপোবনে শকুন্তলার মতো।"[৫০] এরাই হল রামধনুর প্রাণ, এদের জন্যই রামধনুতে রঙ আছে। কাহিনীর শেষে জানা যায় লেখক স্বপ্নঘোরে ছিলেন, কিন্তু কী নিষ্পাপ এবং কোমল এই স্বপ্নটি!

সাহিত্যে, একটি মুহূর্তের পর আর একটি মুহূর্ত আসে, আর চিত্রে, এক নজরে সমস্তটা দেখা যায়। এ দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, অবনীন্দ্রনাথ 'পথে বিপথে'তে তা দূর করেছেন এইভাবে যে এখানেও চিত্র আছে, অথচ সেগুলি সাহিত্যের নিয়ম মেনে একের পর এক আসছে পটুয়ার পট দেখাবার মতো ক'রে—ছবির পর ছবি জুড়ে গল্পের দেহ তৈরি হচ্ছে। 'গুরুজি' গল্পটির কথা ধরা যাক।

১ম ছবি—"গেরুয়া মলিদার ওভারকোটটার উপরে আজকালের স্বামীজির ধরণে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম।"

২য় ছবি—"অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে থার্ড এবং ফোর্থ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছক্কড় গাড়িতে ধূলো এবং ঝাঁকানি খেতে খেতে···খানার ভিতরে উলটে পড়লেম। একখানা মোটরগাড়ি একরাশ ধূলো আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের নাক চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।"

৩য় ছবি—"ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাঘ-থাবা পুরোনো মেহগ্নি কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল অনেকখানি ধুলো···ফুলদানটার একটা হাতল আর খানিকটা কানাভাঙা ; আর তার গায়ে বড় বড় গোলাপফুল, প্রজাপতি আঁকা।"

৪র্থ ছবি—"তাঁর হাতের চিমটেয় তিনি তিনটে পাখির খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া বসনটা টুকরো টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা ; পৈতের সূতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক....।"

৫ম ছবি—"এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাদা পাথরে মোড়া যেন একটা চাঁদের আলোর গহ্বরে এসে ঢুকলেন। মাঝে স্ফটিকের চেয়ে পরিষ্কার গোলাপজলের ফোয়ারা!"

৬ষ্ঠ ছবি—"পাখির ডানা দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে পাঁচমিশিলি বদ রঙ-মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মত ছড়িয়ে রইল। নির্জীব পাখিটার হল্‌দে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কষের মত পাতলা গেরুয়া রক্ত সেই রুমালখানার সাদা রঙ মলিন করে দিচ্ছে, আর মূর্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু দুটো জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে সেইদিকে চেয়ে আছেন...।"[৪১] এমনি আরো কিছু ছবি, কিন্তু প্রত্যেকটি এক জাতীয় নয়। প্রথম এবং তৃতীয় ছবিটি হল বাস্তবের হুবহু প্রতিফলন। দ্বিতীয় ছবিতে পেট্রোলের বিকট গন্ধ নাক-চোখের ওপর ছড়িয়ে দেবার কথা আছে। চতুর্থ ছবিটি হল নানাপ্রকার বিপরীতের সমাহার। যা দিয়ে যা করার নয়, গুরুজি তাই করেছেন, ফলে প্রচলিত সব ধারণাগুলো পিছু হটে যাচ্ছে। পঞ্চম ছবিটি অনাবিল পবিত্র শুভ্রতার, ষষ্ঠ ছবিটি নিষ্ঠুরতার। এসব মিলিয়ে পাঠকেরা একই সঙ্গে নানান ভুবনে পা রাখেন। যেন একটা চিত্র প্রদর্শনীতে প্রবেশ করেছি আমরা—এরকম অনুভূতি হয়।

যিনি শিল্পী, তাঁর দৃষ্টিতে হাসি-কান্না আলো-ছায়া আনন্দ-বেদনা এসবই একাকার ; কারণ যা চিত্তকে আলোড়িত করে, বিনোদিত করে সেই কথাটিই তিনি হৃদয়ে রাখেন। অবনীন্দ্রনাথ সে-ই শিল্পী—তাই অনায়াসেই গল্পের সঙ্গে ছবি, এবং ছবির সঙ্গে গল্পকে একাকার ক'রে দিয়ে বললেন, "তেঁতুলে মিশ্রিতে মিলে একটা সরবৎ হল। রসের সমাবেশ করা চাই আর্টে। প্রকৃতিও তাই করে।"[৪২]

প্রচলিত বানানগুলি ইচ্ছেমতো বদলে নেন তিনি (উর্বর, আক, মেহগ্নি), কারণ—"স্পেলিং দিয়ে কি করব, আমি স্পেল বাউণ্ড করি।"[৪৩] —বলেন এই কথা। আমরা 'স্পেল বাউণ্ড' হবার পরিবর্তে একটানা বাক্যপ্রবাহে ভেসে চলি, অনুভব করি চোখ মেলে সুপ্রত্যক্ষভাবে দেখার আনন্দ। এই আনন্দ-ই আমাদের পরম প্রাপ্তি হয়ে ওঠে।

উল্লেখপঞ্জী :

১. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (চতুর্থ রূপা সংস্করণ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৮৮ আগস্ট, 'অরূপ না রূপ', কলকাতা, রূপা, ৪৭ পৃষ্ঠা।

২. অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৯ জুন, 'পথে বিপথে', কলকাতা, প্রকাশভবন, ৬২ পৃষ্ঠা।

৩. তদেব, ৬ পৃষ্ঠা।

৪. তদেব, ২৩ পৃষ্ঠা।

৫. তদেব, ৬২ পৃষ্ঠা।

৬. তদেব, গুরুজি গল্প, ২২ পৃষ্ঠা।

৭. তদেব, অস্থি গল্প, ১৬ পৃষ্ঠা।

৮. তদেব, ১১২ পৃষ্ঠা।

৯. তদেব, ১১২ পৃষ্ঠা।

১০. তদেব, ৯৮ পৃষ্ঠা।

১১. তদেব, ১১ পৃষ্ঠা।

১২. তদেব, ১১১-১১২ পৃষ্ঠা।

১৩. তদেব, ১০৫ পৃষ্ঠা।

১৪. তদেব, ১০৪ পৃষ্ঠা।
১৫. তদেব, ৭২ পৃষ্ঠা।
১৬. তদেব, ৫৫ পৃষ্ঠা।
১৭. তদেব, ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।
১৮. পশ্চিমবঙ্গ (অবনীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০২) যোগেন চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথের ছবি, ৯৫ পৃষ্ঠা।
১৯. অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, ১ম সংস্করণ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬ সেপ্টেম্বর, কলকাতা, প্রকাশভবন, ৩ পৃষ্ঠা।
২০. অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, ১ম সংস্করণ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৯ জুন, 'পথে বিপথে', কলকাতা, প্রকাশভবন, ৬-৭ পৃষ্ঠা।
২১. তদেব, ১১ পৃষ্ঠা।
২২. তদেব, ৫৩ পৃষ্ঠা।
২৩. অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সং), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৪ অক্টোবর, কলকাতা, প্রকাশভবন, ২৯৮ পৃষ্ঠা।
২৪. অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, ১ম সং), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৯ জুন, কলকাতা, প্রকাশভবন, ১১৪ পৃষ্ঠা।
২৫. তদেব, ১৪ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
২৬. তদেব, ১১২—১১৩ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
২৭. শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, রাণী চন্দ, ১৩৭৯ বৈশাখ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১২৩ পৃষ্ঠা।
২৮. অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সং), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৪ অক্টোবর, কলকাতা, প্রকাশভবন, ৩১ পৃষ্ঠা।
২৯. অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, ১ম সং), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, প্রকাশভবন, ৪৫ পৃষ্ঠা।
৩০. তদেব, ৪৫ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩১. তদেব, ৬২ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩২. তদেব, ১১২ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩৩. অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, ১ম সং), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬ সেপ্টেম্বর, কলকাতা প্রকাশভবন, ২১৪ পৃষ্ঠা।
৩৪. অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড, ১ম সং), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পথে বিপথে', ১৯৭৯ জুন, কলকাতা, প্রকাশভবন, ১১ পৃষ্ঠা।
৩৫. তদেব, ৪৩ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩৬. তদেব, ৫৯ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩৭. তদেব, ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩৮. তদেব, ৯৮ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৩৯. তদেব, ১৭ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৪০. তদেব, ৭২ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৪১. তদেব, ১৮-২৯ পৃষ্ঠা। পথে বিপথে।
৪২. শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, রাণী চন্দ, ১৩৭৯ বৈশাখ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬১ পৃষ্ঠা।
৪৩. তদেব, ১৩২ পৃষ্ঠা।

চিত্রাঙ্গদা-রক্তকরবী-সে : তিন চিত্রশিল্পীর চোখে

শিল্পের নানা মাধ্যম—চিত্র এবং সাহিত্য তাদেরই মধ্যকার দুটি। এ দুয়ের মধ্যকার সাম্যের দিকটি এই, যে, উভয়েই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন ক্ষমতায় স্পর্শ করতে চায়। এ বিষয়ে আর একটি কথা হ'ল, আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যের দ্বিবিধ চরিত্র নির্দেশ করেছিলেন—তার একটি শ্রব্য, অপরটি দৃশ্য। বাক্‌শিল্পের প্রাথমিক স্ফূর্তি শ্রবণের মাধ্যমেই। যখন পড়ি, বা যখন শুনি, তখন মনে বোধসঞ্চারের অব্যবহিত কারণ হয় দর্শন। এই 'দর্শন'-এর সঙ্গেই চিত্রশিল্পের সংযোগ—ফলে সাহিত্য ও চিত্রের মধ্যে এই একটা সম্পর্কের সেতু আছে।

যে তিন চিত্রশিল্পীর কথা শিরোনামে আছে, তাঁরা শিল্পের একাধিক মাধ্যমে বিচরণ করেছেন। পারিবারিক সূত্রে বাগ্‌দেবীর বরপুত্রদের মধ্যিখানে এঁরা বড় হয়েছেন, শিল্পের নানা মাধ্যম সে পরিবারে চর্চিত হয়েছে। তাই এই বোধ এঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, যে, শিল্পে শিল্পে কোনো বিরোধ নেই—প্রকাশিতব্য অনুভব সর্বক্ষেত্রেই এক—ভিন্নতা শুধু প্রকাশমাধ্যমে। তাই যখন এঁরা একে অপরের কলমচালনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তুলিচালনা করেছেন, তখন সাহিত্যের কথিত ভাষা এবং ছবির মধ্যে অনেক মিল বজায় রেখেছেন। অমিল যেখানে, সেইখানেই শিল্পীর নিজস্বতা।

এই মিলের কথা নানা দেশের নানা সমালোচক নানাসময়ে বলেছিলেন। সার ফিলিপ সিডনী তাঁর 'An Apology for Poetry' গ্রন্থে কবিতাকে "... a speaking picture" আখ্যা দিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কিছুকাল পরে ফরাসী লেখক Alphonse du Flesney তাঁর De Arte Graphica গ্রন্থে লিখলেন—"Painting is poetry without words, poetry is painting with words". সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জর্মান নাট্যকার তথা সমালোচক G. E. Lessing তাঁর Laokoon and How the Ancients Represented Death গ্রন্থে সাহিত্য ও চিত্রের মিল-অমিল নির্ণয় প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তে আসেন—"They are equitable neighbouring powers". তাঁর মতে, সাহিত্য হ'ল Art of time এতে শব্দের পর শব্দ বসিয়ে বক্তব্য বিষয়টির দেহ নির্মিত হয়—অর্থাৎ এখানে মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরা পড়ে, চিত্র হ'ল Art of space—এতে শিল্পীর সমগ্র বক্তব্যটি এক লহমায় দর্শকের সামনে উদ্ভাসিত হয়। প্রাচ্য আলঙ্কারিক যশোধর পণ্ডিত বাৎস্যায়নের কামসূত্রের প্রথম অধিকরণে তৃতীয় অধ্যায়ের টীকা করতে গিয়ে, চারু শিল্পের উপাদান বিষয়ে একটি সাধারণ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটি হ'ল—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যম্ বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

অর্থাৎ চিত্রের ছ'টি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল রূপভেদ, প্রমা, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। চিত্রশিল্প প্রসঙ্গে প্রদত্ত হ'লেও এই নির্দেশ সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য—সর্বত্রই প্রযুক্ত হ'তে পারে।

সাহিত্য এবং চিত্রের এই তাত্ত্বিক সাম্যের প্রয়োগগত দিকটি এবার দেখা যাক। Illustration বা চিত্রবিভূষণ নামে একটি অভিধা আছে, যা দান করা হয় কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চিত্রকে। এই সঙ্গতি তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত হ'বার যোগ্য—(১) ছবি যেখানে কাহিনীর দৃশ্যময় রূপমাত্র। (২) ছবি ও কাহিনী যখন পরস্পরের পরিপূরক—চিত্র এখানে বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্য মাত্রার আভাস আনে। (৩) ছবি এখানে কাহিনীর অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে নানাভাবে দ্যোতিত করে। কাহিনীর সঙ্গী হ'য়েও ছবি এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত—সে স্বাতন্ত্র্য চিত্রশিল্পীর নিজস্ব জীবনাবোধসঞ্জাত।

এই প্রাক্কথনের পরে, মূল বিষয়টির দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৩৩-এ 'বিচিত্রিতা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিল, যাতে গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কয়েকজন শিল্পীর আঁকা মোট একত্রিশখানি ছবি ছিল ; প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে সুর-মেলানো কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যাপারটি এত উপভোগ্য হয়েছিল, যে, একের সঙ্গে অপর মাধ্যমকে মেলাবার ব্যাপারে এঁদের দক্ষতার অপরাপর উদাহরণের প্রতি মনোযোগ ধাবিত হ'ল। অবনীন্দ্র-রবীন্দ্র তো খ্যাতনামা সাহিত্যশিল্পী, এমনকি দেখা গেল, গগনেন্দ্রনাথও 'ভোঁদড় বাহাদুর' নামে একখানি চমৎকার শিশুপাঠ্য বই লিখেছেন। আরো জানা গেল, রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থের চিত্রবিভূষণের দায়িত্ব নিয়েছেন অপর দুই শিল্পী। সে দুটি হ'ল চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) এবং রক্তকরবী (১৯২৪)। আর ১৯৩৭-এ লেখা 'সে'-কে নিজেই ছবি দিয়ে সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৮৯২-তে যখন 'চিত্রাঙ্গদা' রচিত হয়, অবনীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ—তখন তিনি ইংরেজশিল্পী সি. এফ. পামারের কাছে তেলরঙ্ ও জলরঙের কাজ শিখছেন—পরবর্তীকালের 'গণেশজননী' বা 'মুখোশ' সিরিজের ছবির বিশিষ্টতা তখনো তাঁর সৃষ্টিতে ফুটে ওঠেনি। তবে চিত্রাঙ্গদার চিত্রবিভূষণে, ঐ কাহিনী বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখা যায়, একটি সাপ জড়িয়ে আছে একটি বড় গাছকে—আর ঐ দৃশ্যেই চিত্রাঙ্গদা অতুলসৌন্দর্যের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন মদনদেবের কাছে। এ যেন একটি ইঙ্গিত, যে, অচিরেই ঐ সৌন্দর্য নাগপাশে বন্দী ক'রে ফেলবে চিত্রাঙ্গদার আত্মস্বরূপকে, এবং তাঁকে এমত আক্ষেপ করতে হবে—

"....................হায়, আমারে করিল
অতিক্রম, আমার এ তুচ্ছ দেহখানা—"

৪৭ পৃষ্ঠার ছবিতে (১৩৯১, চৈত্র সংস্করণে) দেখি, মৃত্তিকাপ্রোথিত একটি বর্শাকে জড়িয়ে আছে একটি লতা। ঐ বর্শা দেশরক্ষয়িত্রী চিত্রাঙ্গদার প্রতিভূ—আবার ব্রততীসুলভ কোমলতাও আছে তার মনে। তিনি বীর্যে পুরুষ, স্নেহে নারী। অপর একটি ব্যঞ্জনাও মনে আসে—হর্ষ-অচেতন-বর্ষে চিত্রাঙ্গদার এই বর্শা কর্মহীন—তাই লতাজাল তাকে আচ্ছন্ন করেছে। ২৮ পৃষ্ঠার ছবির বিষয়, অরণ্যমধ্যে শায়িতা এলায়িতকুন্তলা চিত্রাঙ্গদা। ফুটে-ওঠা ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছেন—

".................যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া অরণ্যের

পিতৃমাতৃহীন ফুল।”

এ ছবিটি রেখাচিত্র। বস্তুত, চিত্রাঙ্গদার প্রায় সব ছবিগুলিই তাই—মনে হয়, ছবিগুলির ভার (Mass) কম। এই পৃথিবীর বুকে সুরূপা চিত্রাঙ্গদার অস্তিত্বও যেন ঐপ্রকার লঘুস্পর্শ—তাঁর কোনো মূল নেই—তিনি যেন পল্লবপ্রান্তভাগে দোদুল্যমান একটি প্রভাতী শিশিরের কণা—নামহীন, পরিচয়হীন! ‘মানসী’ কাব্যের ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতার অহল্যা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় এই ছবিটির সূত্রে।

‘চিত্রাঙ্গদা’র বত্রিশটি ছবির মধ্যে অর্জুন মাত্র একটিতে উপস্থিত; সেই একমাত্র উপস্থিতির দৃশ্যেও তাঁর মুখ দৃশ্যমান নয়। চিত্রশিল্পী কাহিনীটি চিত্রাঙ্গদার দিক থেকে দেখেছেন। একবছরের জন্য লভ্য অতুলন রূপের আকর্ষণরজ্জুতে আবদ্ধ অর্জুনের সঙ্গে মিলনের অসহ্য পুলকে দেশকাল-জীবনমরণ চিত্রাঙ্গদার কাছে একাকার হ'য়ে গেলেও, ক্ষণপরেই নিগূঢ় অপমানে বিদ্ধ হয়েছেন চিত্রাঙ্গদা, বলেছেন—

“.....এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে।”

অর্জুন এই ‘শ্রেষ্ঠ-আমি’-র পাশে দাঁড়াননি। তাই চিত্রাঙ্গদা সন্তরণকালে একা, মাল্যরচনাকালেও একা। এগুলি যেন তাঁর আত্মচিন্তার সময়। যে প্রেম দুটি মানুষের মনের মিলন ঘটিয়ে দেয়, সে প্রেমের মুহূর্ত এখনো তাঁর জীবনে আসেনি। যেদিন অর্জুন আসল চিত্রাঙ্গদাকে খুঁজে ফিরেছেন, সেদিন নাটক পৌঁছেছে সংশয়ের অবস.নক্ষেত্রে। তার প্রতীক হিসেবে একটি স্থিরশিখা-প্রদীপের চিত্র রচিত হয়েছে।

নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখা .শান্তরসের, অর্থাৎ ‘শম’ স্থায়িভাবের ইঙ্গিত দেয়। নাটকের বৃত্ত এখানে সম্পূর্ণ। চিত্রাঙ্গদা যাঁকে প্রকাশ করতে চান—অর্জুন তাঁকেই লাভ করতে চান। তাই দ্বন্দ্ব অবসিত, চাঞ্চল্য প্রশমিত। প্রদীপের অকম্প শিখা তারই প্রতীক।

অর্জুনের কাছে আত্মপরিচয়দানকালে সূর্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সকল গোপনতার আবরণ উন্মোচন করেছেন চিত্রাঙ্গদা—সে চিত্রেও অর্জুন নেই। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অনুভবটি এইপ্রকার, যে, শুধুমাত্র অর্জুনের কাছে নয়—সমগ্র বিশ্বের কাছে চিত্রাঙ্গদা আপন পরিচয় দিচ্ছেন। সূর্য যেমন অন্ধকারের মধ্য থেকে দিনকে তুলে আনেন—তেমনি আপন অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে চিত্রাঙ্গদা নিজেকে উঠিয়ে এনেছেন আত্মমর্যাদার জগতে, বলতে পেরেছেন—

“............................আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নহি ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও,...
আমার পাইবে তবে পরিচয়।”

পুরো বক্তব্যের ক্রিয়াপদগুলি ভবিষ্যৎকালের। অর্জুন এখনো চিত্রাঙ্গদার সম্যক্ পরিচয় পাননি, কিঞ্চিৎ অনুমান করেছেন মাত্র। তাই আলোচ্য ছবিটিই অবনীন্দ্র-ধারণায় যথার্থ উপসংহার।

* * *

'রক্তকরবী' যখন রচিত হয়, তখন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স সাতান্ন। চিত্রাশিল্পের জগতে ইতিমধ্যেই নতুনত্ব যোগ করেছেন তিনি। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর চিত্রশিল্পের পাঠগ্রহণ বহু আগেই শেষ হ'য়ে গেছে। তার পরে আঁকা তাঁর ছবিগুলিতে কখনো রয়েছে বর্ণময়তা, কখনো বর্ণবিরলতা ; আলোকিত জ্যামিতিক পটভূমিতে শ্যিলুট আঁকছেন, প্রধানত বক্ররেখার সাহায্যে আঁকছেন অবগুণ্ঠিতা ছয় বধূকে—কখনো আঁকছেন নানাপ্রকার কোণ-যুক্ত ছবি—যার মধ্যে রয়েছে কিউবিজ্‌মের আভাস। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪—মোটামুটিভাবে এই সময়সীমার মধ্যে যে কিউবিস্ট শিল্প-আন্দোলন ঘটেছিল, তার ল কথাটা ছিল, প্রচলিত তিনটি মাত্রা ছাড়াও ছবির মধ্যে চতুর্থ মাত্রা অর্থাৎ 'সময়'ক উপস্থাপিত করা। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-এই তিনটি মাত্রা প্রকাশের জন্য তুলির টান বা আলোছায়ার কৌশল ব্যবহার করা হয়। চতুর্থ মাত্রাটিকে পরিস্ফুট করবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করা হ'ল ; যেমন কখনো চিত্রের মধ্যে একটা স্থাপত্য-সুলভ ঘনত্ব প্রকাশ করা হত ; কখনো বা কিউবিস্ট চিত্রশিল্পীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখে, পরে সেই খণ্ডরূপগুলিকে নিজেদের ধারণামতো জুড়ে দিতেন। বিভিন্ন তলঘনকের গড়ন এবং কোণ ব্যবহৃত হ'ল এই ধরনের ছবিতে। গগনেন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে যে সম্পূর্ণভাবে এই ধারার আনুগত্য করেছেন—তাও নয়। এর ছবিগুলিতে বর্গক্ষেত্র-আয়তক্ষেত্র-ত্রিভুজের জ্যামিতিক আকার যেমন আছে, তেমনি আছে আলো-ছায়ার রেখাজাল, এবং প্রকাশবাদী ছবিসুলভ অনুভূতির অভিঘাত।

৬৫ পৃষ্ঠার ছবিটিতে (১৯৭৫ সংস্করণ) দেখি, অন্ধকার গুহার মধ্যে একটি আলোকিত সিঁড়ি—পা রাখবার তলগুলি সাদা, বাকি সব কালো। সিঁড়ির পাশে আলোর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের দেহরেখাটুকু মাত্র দেখা যায়—সে-ই যেন নন্দিনী। মনে পড়ে যায়, বিশুর জিজ্ঞাসা—

> "বিশু। এখন কোথায় যাবি?
> নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে।"

রঞ্জন পা রাখবে ব'লেই সিঁড়ির ধাপ আলোকিত, রঞ্জনই তো নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আলোকদূত হ'য়ে আসে। সিঁড়িটি একমুখী নয় ; এবং তারও যথাযোগ্য কারণ আছে। রঞ্জন তো শুধুমাত্র নন্দিনীর কাছে নয়—যক্ষপুরীর সর্বত্র আসবে—তাই সিঁড়িটিও নানামুখী। ত পর একটি ছবিতে, কালোর মধ্যে সাদা আঁচড়ে বাঁদিকে শহরের, ডানদিকে কঙ্কালসার মানুষের, এবং মাঝখানে উদ্যত যন্ত্রের (অথবা যন্ত্রাস্ত্রের) ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ব্যঞ্জনাটি যেন এইপ্রকার—যন্ত্রের শাসনে মানুষের শ্রমে ঐ শহর নির্মিত—আর ঐ শ্রমেই মানুষগুলি কঙ্কালসার, যেন 'রাজার এঁটো'। অন্য একখানি ছবিতে দেখি, জালের দিকে ডানহাত বাড়িয়ে রেখেছে নন্দিনী—জালের মধ্য থেকে একখানি বাম করতল সন্তর্পণ ভঙ্গিতে

বেরিয়ে এসেছে। কাহিনীর রাজা বলেছিলেন,—"জানালার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো"—নন্দিনী উত্তরে জানিয়েছিল, যে, সব ছেড়ে শুধুমাত্র হাতখানি বেরিয়ে এলে তার ভয় করবে। চিত্রে কিন্তু ঐ ভয়ের আভাস নেই—বরং স্পর্শটুকুর জন্য রাজার আকাঙ্ক্ষাটুকু যেন নন্দিনীকেও স্পর্শ করছে। রাজার অপর একটি বক্তব্যও এই ছবির সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। সেটি হ'ল—"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত আমি রিক্ত আমি ক্লান্ত।" এখানে রাজার হাতের ভঙ্গিটি ভরতনাট্যম্ নৃত্যশৈলীর একক হস্তমুদ্রার মত। এই মুদ্রার অনুষঙ্গে রাজার আর একটি সংলাপও মনে পড়ে—"সরোবর কি ফেনার নূপুর পরা ঝর্ণার মতো নাচতে পারে? যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।" যেন নিজের তৈরি কাঠিন্যের আবরণ ভাঙতে না-পারার ক্ষোভ রয়েছে রাজার মনে। বেরিয়ে-আসা হাতটি আসলে জালের আড়াল থেকে বেরিয়ে-আসা এক মানুষ—সে চায় নন্দিনীর হাতের কুন্দফুলের মালাটি।

গোঁসাই-এর ছবিটি প্রতিনিধিমূলক—হাতে জপের মালা এবং পিছনে ভক্ত নারী-পুরুষের দল—এ যেন মঞ্চাভিনয়কালে গোঁসাইকে ঠিক কেমন দেখতে লাগা উচিত—তারই চিত্রিত নির্দেশ।

এ নাটকের দ্বিতীয় ছবিটিতে সাদা এবং ছাই রঙ্ ব্যবহার ক'রে কঠিন জালের আড়াল ও তার অন্তরালে ধাতব প্রকৃতিযুক্ত রাজার আভাস দেওয়া হয়েছে। নন্দিনী যে ঐ জাল ছিঁড়তে এসেছে, ছবিতেও তার ইঙ্গিত আছে। নাটকের প্রথম ছবিতেই দেখা যায় বাঁদিকে কিছু জালের অংশ—আর ডানদিকে যেন পাতালঘরের লোহার জাফরি—যার ফাঁক দিয়ে যক্ষপুরীতে আলো এসে পড়ছে। নন্দিনী নিজেই তো এই অন্ধকার যক্ষপুরীতে এসে পড়া এক ঝলক আলো! নাটকের একেবারে শেষ ছবিতে, মৃত রঞ্জনকে জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে আছে নন্দিনী, তার মাথায় রক্তকরবীর মঞ্জরী। এই ছবিটি কিন্তু মনকে বিষণ্ণ করে না, উদ্দীপ্ত করে। যে যক্ষপুরীতে একটিমাত্র রক্তকরবী গাছ বেঁচে থেকে ফুল ফোটাতো, সে গাছ আজ বিশু-অধ্যাপক-ফাগুলাল—সকলের মনেই শাখাবিস্তার করেছে। নন্দিনী আর নেই—তবুও সে আছে। প্রচ্ছদের ছবিতে রয়েছে হলুদ ও কালো রঙে রচিত এক বিশাল রেখার জাল—যা দেখতে মাকড়সার জালের মতো এবং মনে হয় সকল জীবই ঐ জালে আটকা পড়বে। ছবির নীচে, ডানদিকের কোণে রয়েছে দুটি রক্তকরবী ফুল—দুটি লাল রঙের হাত ধরতে চাইছে তাদের। লাল রঙ সংগ্রামের কথা বলে। এখানে আটকে-ফেলার সঙ্গে ফুটে-ওঠবার লড়াই—মকররাজের যান্ত্রিক প্রকৃতির সঙ্গে নন্দিনীর স্বাভাবিকতার লড়াই। গগনেন্দ্রনাথ অনেকসময়ই হাতটুকুমাত্র দেখিয়ে গোটা মানুষের অথবা মানবসমাজের কথা বলেছেন। রাজার হাত বোঝায় রাজার মনের কোমল অংশটিকে—ফুল ধরতে চাওয়া হাত সম্ভবতঃ বোঝায় একদল মানুষকে, যারা যক্ষপুরীতে ফুল ফোটাতে চায়।

৫৩ পৃষ্ঠার ছবিটির সিংহভাগই কালো। বিদ্‌রির কাজে যেমন ব্ল্যাকমেটাল-এর ওপর রূপার আঁচড় টেনে নক্সা ফোটানো হয়—এখানেও তেমনি কালোর ওপর কয়েকটি সাদা

আঁচড় টেনে একটি বিষয়বস্তুর আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বাঁয়ে একফালি চাঁদ—ডাইনে উপবিষ্ট এক একাকী পুরুষ—মাঝখানে নদী। মনে হয় এটি বিশুপাগলের ছবি—সমৃদ্ধির লোভে সস্ত্রীক যক্ষপুরীতে নেমে আসার পর যার ভুল ভেঙেছে—কিন্তু যে আর মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাবার পথ খুঁজে পায় না, যার উপলব্ধি হয়—"জীবন হ'তে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি।"

এইসব ছবিগুলি গগনেন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বিষয়ক অনুভবকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি এখানে বাইরের রূপকে অগ্রাহ্য ক'রে চরিত্রের আন্তরসত্তার কাছে পৌঁছে গেছেন। ছবিগুলি যেন ধাপে ধাপে কাহিনীকে উন্মোচিত করেছে। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়াকে Lessing-এর ভাষায় Art of time বলা যায়। প্রসঙ্গত শ্রীগণেশ পাইন রচিত 'রক্তকরবী' নামের ছবিটির কথাও মনে পড়ে—যেখানে নানাপ্রকার অচেনা জ্যামিতিক বস্তুতে পরিপূর্ণ একটি ঘরের বাঁদিকে ঢিলে গেরুয়া পোশাকপরা নিকষকালো বিশাল এক ধাতবমূর্তি দণ্ডায়মান—তার মুখমণ্ডল নাক-চোখ-মুখ বিহীন—মাথায় মুকুটের আভাস—হাত দুটি ওপরে তোলা। মনে হয় এই-ই রাজা—কারণ নাটকে রাজার তুলনা হচ্ছে ক্লান্ত পাহাড়, হাজার বছরের পুরোনো বট—এই তুলনাগুলি রাজার ভার-এর (Mass) দিকটিকে বোঝায়। ছবিতেও ঐ ভাবটি অনুভূত। ছবির ডানদিকে কয়েকধাপ অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়ির একটি ধাপে খোলাচুলে বসে আছে নন্দিনী—তার নিম্নমুখী দৃষ্টি লগ্ন হ'য়ে আছে পায়ের কাছে শোয়ানো রঞ্জনের দেহে। ছবিটি দেখলে মনে হয়, রঞ্জনের প্রতি নন্দিনীর দৃষ্টিমগ্নতা রাজার মধ্যে একটা লড়াই-এর জন্ম দিয়েছে—সে একইসঙ্গে দুহাত তুলে এদের আঘাত করতে চায়, আবার হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণও করতে চায়। Lessing দেখলে হয়তো এ ছবিকেই বলতেন Art of space. শিল্পী এখানে বাহ্যরূপ থেকে গুণে পৌঁছে গেছেন, গুণটি বুঝে নিয়ে আবার রূপে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

* * *

'সে'-তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই চিত্রশিল্পী। এর আগে, ১৯২৫-এ পূরবীর পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিতে ডুড্‌ল্‌স তৈরি করেছেন তিনি—রেখার সঙ্গে রেখার মিলন ঘটাচ্ছেন—এবং ক্রমশ তাঁর মনে হচ্ছে যে, চিত্র মনের দরজার একেবারে সামনে হাজির হ'য়ে ব'লতে পারে—'এই যে আমি।' মনে যারা আছে, তারা রেখাতেও আসতে পারে—এই বিশ্বাসের ভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের রেখায় ও লেখায় নানাপ্রকার আজগুবি প্রাণীর জন্ম হয়েছে—অবশ্য এ প্রসঙ্গে অবশ্য-স্মর্তব্য গ্রন্থের নয়-বছুরে শ্রোতাটির অপরিসীম বিশ্বাসক্ষমতার কথা। মাস্টারমশায় এবং সুকুমারের গল্পে আছে পরিচিত রবীন্দ্র-ছোটগল্পের সুর—তবে শ্রোতারও তখন বয়স বেড়েছে।

তাঁর 'সে' আখ্যানের আজগুবি প্রাণীগুলির মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে হিংস্র ঘণ্টাকর্ণ, গম্ভীর ঘণ্টাকর্ণ, গাণ্ডিসাঙডুং (মানুষ, গরু ও সিংহ মিশিয়ে তৈরি এই ভূচর জন্তুটি)। মাথায় কাঁটাওলা, জিব-বার-করা একটা অদ্ভুত রাক্ষসও আছে—যেটাকে দেখলে মনে হয়, লজ্জায় জিব কাটছে। গতিধর্মী রেখা দিয়ে এঁকেছেন খাসালেজুড়ি শেয়ালকে, অথবা মানুষ হবার বাসনায় লেজ কাটাবার পর ঐ শেয়ালের আকুল আর্তনাদকে। এ ধরনের রেখার

বৈশিষ্ট্য হ'ল কাগজ থেকে কলম না তুলে একটানে এঁকে যাওয়া। স্থিতিধর্মী রেখা দিয়ে এঁকেছেন তিনপ্রকার ছবি। প্রথম প্রকারে গুটিকতক লাইনে রূপকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে—যেমন (১) টাক-গোঁফ-চশমা এবং হাসি সমন্বিত জজ্‌সাহেব (২) সদাই দাঁত-বের-করে-থাকা হিউমরাস্ বাঘ (৩) মানবরক্ত-পান নামক অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তবিধান শুনে আকুল বাঘ—ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার ছবিতে রেখার সংখ্যা এত বেশী, যে, তা প্রায় রেখাজাল বা হ্যাচিং সৃষ্টি করেছে। গাছে উপবিষ্ট গেছো বাবা, জিব-ভ্যাঙানো রাক্ষস, দেহবিহীন 'সে'—এর উদাহরণ। তৃতীয় প্রকার ছবিতে রেখাগুলি এমনই নিশ্ছিদ্র যে, মনে হয়, ওগুলি যেন মোটা তুলির টান। 'মানকচু' কিনতে যাওয়া সস্ত্রীক 'সে'-র ছবি এরকমই একটি নমুনা।

প্রতিনিধিমূলক ছবির মধ্যে গম্ভীর ঘণ্টাকর্ণ-র কথা প্রথমেই মনে পড়ে। সে যে তার দুটো লেজের বাড়ি দিয়ে দুকানের ঘণ্টা দুটো বাজিয়ে গম্ভীর আওয়াজ তোলে—তার মুখ দেখলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

রঙীন ছবিগুলি প্রধানত বাদামী ছায় (shade)-এর। এক্ষেত্রে ছবি ও বর্ণনা অনেকসময়েই পরস্পরনিরপেক্ষ। "হৈ রে হৈ মারহাট্টা / গালপাট্টা / আঁটসাট্টা"—ইত্যাদির সঙ্গের ছবিটিতে ঐ হৈ হৈ ধ্বনির মারমূর্তিটা বেশ ফুটলেও, কোনো আঁটসাঁট গালপাট্টা দেখা যায় না। আবার মাস্টারমশায়ের গল্পের মাস্টারমশায়ের চেহারাটি অভিনিবিষ্ট, স্থিতধী—যেন তাঁর বিষয়ে বর্ণনার পরিপূরক, তিনি—"ক্লাসে বসতেন আলগোছে। বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ বলে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে।" তিনি পড়াতেন এইভাবে—"আমার পড়ানো চলে মেঘের মত শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত-অনুসারে।" ছবিটি চমৎকার মেলে এই স্বভাবটির সঙ্গে। সুকুমারের ব্যাপারটিও প্রায় তাই। সে এক স্বপ্ন-দেখা ছেলে—যে সত্যযুগে জন্মাতে পারলে শালগাছ হ'য়ে জন্মাতে চাইত—যে আমাদের 'বলাই'-এর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ছবিটিতে ধরা পড়েছে তার স্বপ্ন-দেখা চোখদুটি।

বাণীর সঙ্গে চিত্রের মিশ্রণ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যম সর্বদাই অপ্রধান—ভাবপ্রকাশই মুখ্য বিষয়। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোভাবও ক্রমশ জটিল হ'য়ে উঠছে—প্রকাশিতব্য অনুভবগুলি হ'য়ে উঠছে বহুমাত্রিক—প্রায়ই একটিমাত্র মাধ্যমের দ্বারা সম্যক আত্মপ্রকাশ কঠিনতর হ'য়ে উঠছে ; ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নৃত্যনাট্য—গীতিআলেখ্য—প্রভৃতি মিশ্রিত-মাধ্যম শিল্পের। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পাতায় এই শিল্পসাঙ্কর্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শিল্পী যদি মিশ্রণে পারদর্শী হন, সম্যক্ ভাবপ্রকাশে সমর্থ হন—তবে তাঁর হাত সবসময়ে শুদ্ধ—এইভাবে ভাববার সময় এসে গেছে। তাই আজকের অর্কেস্ট্রায় নানাধরনের বাজনা বাজে, এবং তা শুনতে ভালো লাগে—কারণ প্রত্যেকটি বাজনার সুরের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকে। বাণী ও চিত্র সম্মিলিতভাবে যদি ঐকতান সৃষ্টি ক'রতে পারে—তবে তার উপভোগ্যতাটাই বিচার্য। চিত্র যদি নিজেকে ঐপ্রকার অপরিহার্য ক'রে তুলতে পারে—তার শিল্পসিদ্ধির উৎকর্ষ যদি এতই বেশী হয়—তবে সহৃদয় সামাজিকের কাছে

সে এক অতিরিক্ত প্রাপ্তি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পাণি"—অর্থাৎ শিল্পে ঘটে আত্মার সংস্কৃতি, পরিমার্জনা। এভাবে ভাবলে করণ ও প্রকরণ (Tools & Technique) ছাড়া বাণী ও চিত্রে বিশেষ পার্থক্য নেই। এই চিন্তা ক্রমশ আমাদের বিভিন্নতা থেকে ঐক্যের দিকে নিয়ে যায়—সে ঐক্যও তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত আর এক প্রাপ্তি।

প্রকৃতির প্রতিশোধ—ভ্রান্তি ও উত্তরণের কাহিনী

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে প্রথমদিকের রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে বলা যায়, ভুল-করা এবং ভুল-ভাঙার নাটক। ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে সব নাটকই অবশ্য তা-ই, কিন্তু এ নাটকের মূলচরিত্র খুব-ই দৃঢ়চিত্তের মানুষ। সে ভুল করেছে সগৌরবে। ব্যাপারটি আমাদের বেশ আকৃষ্ট করে। এমনিতে, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকগুলির যে পরিমাণ পাঠকপ্রিয়তা এবং অভিনয়সিদ্ধি (প্রধানত বহুরূপী নাট্যদলের কল্যাণে) আছে, তার শতাংশের একাংশও এ নাটকের নেই। এমনকি, রবীন্দ্রনাথ নিজে যে এটিকে তাঁর হাতের প্রথম নাটক, যা গানের ছাঁচে ঢালা নয় বলেছিলেন, সে-ই ঐতিহাসিক মূল্য নাটকটির সংলগ্ন হলেও, অন্যান্য, বিশেষত রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির অভ্রভেদী খ্যাতির পাশে বলেই বোধ হয়, এটি একটু আড়ালে পড়ে গেছে।

১৮৮৪-তে যখন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৩। ইতিমধ্যেই সাহিত্যিকের লেখনী চালনা তাঁর অভ্যাস হ'য়ে গেছে—কবিকাহিনী, বনফুল, বাল্মীকি প্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, কালমৃগয়া, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসঙ্গীত, বউঠাকুরাণীর হাট—এগুলি তারই উদাহরণ। এই লেখাগুলির মধ্যে শেষের উপন্যাসটি বাদে অন্যগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, যেন গান ও কবিতার সঙ্গে নাটকের একটা বোঝাপড়া চলছে। নাটক এবং অভিনয় বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা জানা যায় 'জীবনস্মৃতি' থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন—"বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একাজে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে।" গানের বিষয়েও ছিল তাঁর যথার্থ আগ্রহ। গান বিষয়ে পাই তাঁর এই কথাগুলি—"আপনার ইচ্ছেমতো গলায় এসেছে গেয়েছি, গান হয়ে উঠেছে।" এই নিপুণতা ও আগ্রহ যখন কলমের মুখে একযোগে প্রকাশ পেতে লাগল, তখন গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য—এই ধরনের বিভিন্ন সৃষ্টি সম্ভব হ'য়ে উঠল।

পটভূমির কথাও একটু বলে নেওয়া দরকার। একই বীজ ভিন্নপ্রকার জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়—এমনকি যীশুখ্রীষ্টের উপদেশেও পাওয়া গেছে এই কথা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে জমিটা কেমন ছিল? তখন তাঁর বয়স ২৩, সংসার চালাবার গুরুদায়িত্ব কাঁধে চাপেনি, ইতিমধ্যে একবার বিলেত ঘুরে এসেছেন এবং সেখানে থাকাকালীন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দুই শিশুসন্তানের সঙ্গে বালকসুলভ চাপল্যে ও আনন্দে দিন কাটিয়েছেন; সম্ভবত শিশুহৃদয়ের অন্ধিসন্ধি বিষয়েও কিছু ধারণা পেয়েছেন—জীবনে বেশ একপ্রকার পরিণতি এসেছে—যেটাকে এইভাবে বলা যায়, যে, তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন লাজুক বালকের মতো এবং ফিরে এলেন এক সপ্রতিভ যুবকের মতো। ইতিমধ্যে মাঝেমাঝেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ছাদে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হচ্ছে—রবীন্দ্রনাটক, আর তিনি নাটক লিখছেন, প্রয়োজনমতো অভিনয় করছেন, ব্রহ্মসঙ্গীত লিখছেন—কবিতা লিখছেন, এবং কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর যে মনোজগৎটি প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে বিলেত থেকে কিছুই-না-হয়ে ফিরে আসার জন্য মনের মধ্যে একটা ব্যর্থতার ভাব ছিল।

নিরাশা, অকারণ ক্রন্দনপরায়ণতা, মান-অভিমান-ক্রোধ-ক্লান্তি—এসব কিছুই প্রকাশ পাচ্ছিল লেখনীমুখে। তারপর একদিন ভোরবেলা সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দা থেকে পল্লবান্তরালে সূর্যোদয় হ'তে দেখে (যে ব্যাপারটি সকলেরই জানা) হঠাৎ যেন চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল, মনে হল, সমস্ত বিশ্বসংসার এক অপরূপ আনন্দস্রোতে প্লাবিত। এই অভূতপূর্ব অনুভূতি হৃদয়ের বিষাদের স্তরগুলিকে সরিয়ে দিল—এবং সেই অভিজ্ঞতা ধরা পড়ল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। অভিজ্ঞতার এই যে স্তরপরম্পরা রবীন্দ্রনাথ পার হ'য়ে এলেন, ঐ একই পথ পার হ'য়ে আসতে হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীকে। অন্ধকার গুহাতে বসে আপনাতে আপনি অটল হ'য়ে থাকার যে ধ্যান, আমি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছি ভেবে যে মানসকণ্ডূয়ন—সেগুলি সব শেষ হ'য়ে গেছে, যখন নিখিলজীবনপ্রবাহের আনন্দময় রূপটি তাঁর মর্মচক্ষে ধরা পড়েছে, যখন আপন অন্তরের বাৎসল্যস্রোতের মুখে স্থাপিত বাধাটি তিনি অপসারণ করেছেন। এই পথ ধরে আরো হাঁটলে, একথাও বলা যায়, যে, রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ উৎসব প্রাঙ্গণে অভিনব বাৎসল্যে যেন স্বীয় শৈশবস্মৃতি ফিরে পান—

"কে রে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে, হাসির প্রবাহ তোর
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।"

—সন্ন্যাসীর জীবনে অবশ্য একথা বলার সুযোগ আর আসেনি। তবু আপন উপলব্ধির ফলে তাঁর হৃদয় যে খুলে গেল, সেই অবারিত প্রাঙ্গণে যে জগতের অবাধ প্রবেশাধিকার রইল—তার মধ্য দিয়েই সন্ন্যাসী স্বাভাবিকতার বৃত্তে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই সন্ন্যাসীর কাহিনী রচিত হয়েছিল কারোয়ার-এ।

কর্ণাটকের প্রধান নগরগুলির মধ্যে একটির নাম কারোয়ার। সমুদ্রতীরবর্তী একটি সুন্দর বন্দরনগর এটি—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জজের বাঙ্‌লো সমুদ্রের এত কাছে অবস্থিত ছিল যে বর্ষার সময়ে সমুদ্রের ঢেউ বাংলোর সীমানার মধ্যে এসে তর্জন গর্জন করত। বেড়াতে গিয়ে, জায়গাটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল "অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে,—সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার জন্য একটি মূর্ত্তিমতী ব্যাকুলতা....।" কারোয়ারে থাকাকালীন তাঁরা ছোট নৌকোয় করে শিবাজির প্রাচীন দুর্গ থেকে চাষীর নিকানো উঠান পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন, সমুদ্রের মোহনার কাছে যেতেন—কোথাও কোনো বাধা ছিল না। এই কারোয়ার বাস পর্বটা কবির জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠেছিল কবিতা-নাটক-গদ্য গান রচনার মধ্য দিয়ে। তার মধ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' একটি। এর অব্যবহিত আগে কবি, 'পূর্ণিমায়', 'যোগী', 'নিশীথচেতনা', 'নিশীথজগৎ' প্রভৃতি কবিতাগুলি লিখেছিলেন বলে মনে হয়। এর কারণ, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন—"আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া

বসিয়াছিলাম”—সেকথার আভাস ‘নিশীথজগৎ’ কবিতার মধ্যে আছে। এই কবিতার মধ্যে নাটকের ভাবও আছে, যা উদাহরণের যোগ্য :

“পশ্চিমে করেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রাণে,
স্ফুরিছে দামিনী,
দুঃস্বপন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
চকিত যামিনী।
আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়,
কাঁদিছে পেচক।”

কবিতার এই অংশটি পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মন যেন ধীরে ধীরে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ওই কবিতাটি যেন, প্রদীপ জ্বালবার আগে সলতে পাকাবার পর্যায়।

দুই

মূল নাটকটির দিকে এবার তাকানো যাক। এর কাহিনী অংশ অতি সামান্য। মূল চরিত্র এক সন্ন্যাসী, যিনি গুহায় বাস করেন, এবং সদা ধ্যান করেন। তিনি মহাজ্ঞানী, ইন্দ্রিয়জিৎ—সমস্ত ভেদাভেদ তুচ্ছ ক'রে তাঁর মন নিষ্কাম। একদিন এই প্রকৃতির পীড়ন তিনি সহ্য করেছিলেন। আজ একান্তভাবে সেই প্রকৃতির উপর জয়ী হ'বার চেষ্টা ক'রে তিনি সফল হয়েছেন—সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর সাফল্য এই প্রকার—

“বসে বসে চন্দ্র সূর্য দিয়েছি নিবায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।”

নিজের ধারণার অনুরূপ সিদ্ধিলাভের জন্য সন্ন্যাসী গুহা ত্যাগ ক'রে লোকালয়ে প্রবেশ করেছেন। বহুদিনের অনভ্যাস, তাই সূর্যালোকে, জনারণ্যে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছেন—তাঁর মতে—

“আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।
....
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণ ভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।”

রাজপথ দিয়ে নানা লোক নানা কথা আলোচনা করতে করতে চলেছে—কৃষকেরা চলেছে গান গাইতে গাইতে—এসব দেখে তাঁর মনে হয়, যে, এইসব সাধারণ মানুষেরা এক ক্ষুদ্র বিশ্বের অসার জীবলীলায় মজে আছে। এই জীবলীলায় অংশগ্রহণ করেছে সর্বস্তরের নরনারী, এমনকি তথাকথিত দুই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণবালকও আছে। অবশেষে, ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর স্পর্শের অযোগ্য বালিকা কন্যাকে দেখামাত্র শুরু হ'ল গুঞ্জনধ্বনি—না-ছোঁয়ার সতর্কবার্তা। এ বালিকার কাতরতা অন্নবস্ত্রের অভাবে যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী স্নেহময় গুরুজনের অভাবে। এ বালিকা কারোর সদাসতর্ক স্নেহ চায়। সন্ন্যাসী এই কন্যাটিকে মানসিক আশ্রয় দিলেন এইটে প্রতিপন্ন করার জন্য, যে, তিনি শুচি-অশুচি ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে উঠেছেন। এইখানেই সন্ন্যাসীর কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করল। তিনি দাবি করেন যে তাঁর কাছে শুচি-অশুচি সবই সমান, অথচ শুচিতার ধারণায় তাঁর যে বিশ্বাস, তা-ও ত্যাগ করতে পারেননি, তাই বলেন—

"সেই শুচি, ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।"

অর্থাৎ সংসারীরা অশুচি, সংসারত্যাগীরা শুচি। অর্থাৎ, ভেদজ্ঞান তাঁর চিত্তে যথেষ্টই আছে। নির্জন গুহার সাধনা তাঁকে খানিকটা আত্মতৃপ্তি দিয়েছে মাত্র। দ্বিতীয় স্তরে, সন্ন্যাসীর মানবপ্রীতি আপন অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পেল, যখন তিনি বালিকাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, এবং তাঁর গৃহে গেলেন। নাম, ধাম, এগুলির দ্বারা একজন জাগতিক মানুষের identity প্রকাশ পায়। এগুলি ব্যক্তির বিশেষ পরিচয়। সন্ন্যাসী অনায়াসে এইভাবে ভাবতে পারতেন, যে, এ একটি অনাথা বালিকা—তা-ই এর যথেষ্ট পরিচয়। বিশেষত, কিছু পূর্বেই সংসারের মানুষদের ইনি নরপিপীলিকা আখ্যা দিয়েছেন। অথচ পরে একটি পিপীলিকারই নাম জানতে চাইছেন! এখানে একটা প্রশ্ন এসেই যায়। অনেক বিদগ্ধ সমালোচক বলেন যে, প্রথমদিকের রচনা বলেই এ নাটকে মাঝে মাঝেই অপরিণতির চিহ্ন আছে। হয়তো সন্ন্যাসীর সংসারবিবিক্ত চরিত্রগঠনে ঐ প্রকার অপরিণতিজনিত ত্রুটি এটি। আবার এভাবেও ব্যাপারটা দেখা যায়, যে, এগুলি সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ পরিণতির এক একটি ইঙ্গিত। তাই পরবর্তী দৃশ্যের প্রথমেই দেখি, 'পিতা' ডাক শুনে সন্ন্যাসীর মনে হচ্ছে 'আহা'—তিনি যেন চমকে উঠছেন। ভেদজ্ঞান তাহলে তাঁর যথেষ্টই আছে—প্রভু এবং পিতা এ দুই সম্বোধনের পার্থক্য তাঁর মনেও যথোচিতভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এই ক্ষণিক দুর্বলতার পরেই তিনি ফিরে এসেছেন স্বভূমিতে, এবং প্রথমদিকে তাঁর যে তত্ত্ব বিষয়ে তিনি স্বগতোক্তি করছিলেন, এখন বালিকাকেই একনিষ্ঠ শ্রোতা ধরে নিয়ে তাকে সেই তত্ত্ব অর্থাৎ সংসারের অসারতা এবং আপাতমধুরতা বোঝাতে লাগলেন। পাঠকের মনে পুনরায় সংশয় জাগল। যিনি সত্যিকারের সন্ন্যাসী, যিনি অনন্তের যথার্থ ধারণা অন্তরে পেয়েছেন, তিনি তো এত কথা বলে, অন্যের কাছে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন না! বরং তখন তিনি সেই উপলব্ধিতেই বুঁদ হ'য়ে থাকেন। যদি কথাও বলেন, সেগুলি ঐ গভীর অনুভূতিজাত কতকগুলি শব্দ মাত্র। সেক্ষেত্রে নাটকের সন্ন্যাসী যে এত কথা বলেন জগতের খারাপ দিকগুলি সম্বন্ধে—আসলে কি সত্যি সত্যি তাঁর সেকথা মনে হয় না? তাই কি নিজের

কথার প্রতিধ্বনি নিজের কানে শুনে আস্থা বাড়াতে চান?

এ কাহিনীতে সন্ন্যাসী ছাড়া আরো অনেক ধরনের মানুষ উপস্থিত আছেন এবং তাঁদের কারোর চরিত্রই সম্পূর্ণ নয়—বস্তুত তা নাট্যকারের উদ্দেশ্যও ছিল না। এঁরা আসলে ব্যবহৃত হয়েছেন পৃথিবীতে প্রবাহিত জীবনধারার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গকে প্রকাশ করবার জন্য। এঁদের আচরণও লঘু ধরনের, এবং সেটাও ইচ্ছাকৃত, যাতে সন্ন্যাসী এই ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পারেন, যে, এই তুচ্ছ সংসারকে অগ্রাহ্য করে আমি ঠিক কাজই করেছি। যখন বালিকা কঠিন মাটির উপরে শুয়ে অনাদরে ঘুমিয়ে পড়ে, তখনও দেখা যায়, এই সন্ন্যাসী কঠিন-কোমলে আদরে-অনাদরে এখনো ভেদজ্ঞান করেন। ক্ষণপরেই চমকে ভাবেন—

"—এইবেলা ওঠ্ রে সন্ন্যাসী।
পলায়ন! পলায়ন! ছি ছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে,
বালিকা দেখিয়া শেষে পলাইতে হবে।
কখনো না,..........."

সন্ন্যাসী না-পালিয়ে তবু খানিকটা সাহস দেখাতে পারলেন। নচেৎ পাঠক ভাবতে শুরু করেছিল, এ কেমন সিদ্ধি, যাকে পালিয়ে রক্ষা করতে হয়!

রবীন্দ্রনাথ খুব নিপুণভাবে নাটকের নকশাটি বুনেছেন। তাই যখনই সন্ন্যাসী তাঁর ভবিষ্যৎ সঙ্কল্প প্রকাশ ক'রে বলেন—

"কোলাহল মাঝে আমি রচিব নির্জন", তার পিঠোপিঠিই দেখা যায় যে, গ্রামের লোকেরা গান-গল্প-মজার কথা—এগুলো বলছে ও উপভোগ করছে। প্রত্যেকেরই উপভোগের ধারণা পৃথক।

পরের কাহিনী অংশে দেখি, সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়জয়ের দাবিও নিছকই দাবিমাত্র—কারণ সে বালিকার স্পর্শ কামনা করছে—

"দেখি তার অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—"

সন্ন্যাসীর দুর্জয় হৃদয়বৃত্তিতে তৃতীয় ফাটল দেখা দিয়েছে, যখন সন্ন্যাসী বালিকাকে প্রশ্ন করেছেন—

"বাছা এ আঁধারে তুই কেমন রহিবি?"

তারপরেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে দাবী করেন—

"নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।"

তবু সন্ন্যাসীকে আবার সমাধি-আসনে গিয়ে বসতে হ'ল। প্রকৃতির হিংস্র সনাতনী রূপকে লোকচক্ষে ধরে দেবার কাজে যে তিনি সফল হলেন—এমন উদাহরণ পাইনি। বরং আমরা দেখেছি, গুহার মধ্যে তিনি যতটা প্রতিজ্ঞারূঢ়, গুহার বাইরে ততটা নন। এবার যখন তিনি আসন ত্যাগ করে উঠলেন, দেখা গেল তাঁর নিজের ভুলের সংখ্যা বাড়ছে, তিনি নিজেকে স্নেহহীন বলে দাবি করলেও হৃদয়ের অন্তর্লীন স্নেহ দু-একটি বাক্যে ও

শব্দে আত্মপ্রকাশ করছে, যথা—

"আজ বৎসে সারাদিন কাটালি কি করে?'

অথবা, "বাছারে, অমন করে চাহিয়া কেন রে।
কেন রে নয়ন দুটি করে ছলছল।"

বার্নার্ড শ বলেছিলেন, নাটকে সংঘাত চাই-ই। আরো অনেকে বলেছেন ঐ কথা। এ নাটকে সংঘাত হয়েছে সন্ন্যাসীর নিজের প্রকৃত মনের ভাব এবং অর্জিত ধারণার মধ্যে—সংসারপ্রীতি ও সংসারবিমুখতার মধ্যে। তিনি ভাবতে চেষ্টা করেন, যে, সংসার একটি প্রকাণ্ড ছলনা—

"এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় বলে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া,
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।" (চতুর্থ দৃশ্য)

অথচ সেই মানুষটিরই কিছু পরে (সপ্তম দৃশ্যে) মনে হয়—

"জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি।
পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে
....
এমনি মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর
দূর হতে বসে বসে দেখি-না চাহিয়া!"

এমন উদাহরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে নাটকের যত্রতত্র।

পাশ্চাত্য নাটকের বিষয়বস্তুকে সাধারণত এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যে প্রথমে থাকে Rising Action বা নাট্যিক ক্রিয়ার লক্ষ্যমুখে ধাবন, তারপরে থাকে চরম বা climax এবং পরবর্তী স্থান পায় প্রতিক্রিয়া বা Falling action। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে সেই নিরিখে বিচার করলে বলতে হয়, যে, সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে ভুল-ঠিকের দ্বন্দ্ব যদিও বহুক্ষণ থেকেই চলছে, তবে, যখন তিনি বালিকার আদরের পুষ্পসম্ভাবনাময় লতাটিকে সবলে ছিঁড়ে ফেললেন, তখন এল চরম মুহূর্ত। তারপর শুরু হয়েছে প্রতিক্রিয়া—শারীরিক এবং মানসিক। সন্ন্যাসী সবেগে গুহা থেকে বেরিয়ে গেছেন, বালিকা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেছে—এই শারীরিক প্রতিক্রিয়াদৃশ্যের ক্ষণপরেই শুরু হয়েছে ঝড়বৃষ্টি, এবং ঝড়ের প্রবল শব্দ ছাপিয়ে বালিকার বুকফাটা কান্নার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন সন্ন্যাসী। এ কান্না তাঁর হৃদয়ের বাৎসল্যের রুদ্ধমুখ প্রস্রবণকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, জগতের দিকে ফিরে তাকাতে শেখাচ্ছে। তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন সন্ন্যাসীর দণ্ডকমণ্ডলু। তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন পাষাণসঙ্কল্পভার। ভারবিসর্জিত লঘু হৃদয়ে আনন্দের নিশ্বাস ফেলে তিনি নতুন করে বাঁচছেন। ঐ বালিকাকে নিয়ে নতুন করে পিতা-কন্যার নিভৃত সংসার পাতার স্বপ্ন দেখছেন—

"একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী"

বালিকার সন্ধানে গুহামুখে এসে দেখলেন—কন্যাটি ধূলায় পড়ে আছে—এবং তার দেহ পাষাণবৎ হিম, নিশ্বাস রুদ্ধ, হৃদয় স্তব্ধ, মুখমণ্ডল বিবর্ণ। সন্ন্যাসী আর্তনাদ করে উঠলেন। প্রকৃতি তার নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে গেছে।

সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃতির উপর জয়ী হ'তে চেয়েছিলেন, এবং বিশুদ্ধভাবে অনন্তের উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। এই অনন্তের ধারণাটি সন্ন্যাসীর মন-গড়া। এ অনন্ত যেন সংসারের সর্বপ্রকার স্পর্শের বাইরে! একটি অনাথা কন্যা আপন স্নেহপাশে তাঁকে বদ্ধ করে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনল—সীমার মধ্যেই যে অসীমের উপস্থিতি, প্রেমের মধ্যেই যে মুক্তি—এই উপলব্ধি ঘটল সন্ন্যাসীর, এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর ভূমিকা বিষয়ে এইভাবে বলা যায় যে, রোমান্টিক গীতিকবিতার ভাববন্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবননাট্যের সহজ-সরল কখনো বা রূঢ় সত্যগুলি হারিয়ে যেতে বসেছিল, এবারে ফিরে পাওয়া গেল সেগুলিকে। তিনি আবার বাস্তবে অধিষ্ঠিত হলেন। এই নাটকের কিছু অংশে তাই রয়েছে দুটি পক্ষ। একদিকে বিচিত্র সংসার—কতপ্রকার নরনারী—কতরকম মনোভাব, ইচ্ছা ও প্রার্থনা—কত বিচিত্র হাসিকান্না—ভালো-মন্দ-শুচি-অশুচি-বিচ্ছেদ-মিলন—কত বিচিত্র অনুভূতি। আর অন্যদিকে একা সন্ন্যাসী—যিনি চেষ্টা করেছেন সম্মুখস্থ বৈচিত্র্যকে অগ্রাহ্য করতে, নিজেকে বোঝাতে চাইছেন শুচি-অশুচি সুন্দর-বীভৎস—এগুলির মধ্যে ভেদ নেই এবং নিজের অভেদজ্ঞানের গর্বে অন্যদের ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে অগ্রাহ্য করে বিপরীত সাধনপথে যত অগ্রসর হচ্ছেন—মনের মধ্যকার মন ততই তাঁকে টানছে তুচ্ছ প্রাত্যহিকতায় ভরা সাধারণ জীবনের দিকে। অশুচি বালিকা রঘুর কন্যা যখন তাঁকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে আনল, তখন স্নেহের সেতুর উপর অনন্তের শূন্যতা এবং সীমার তুচ্ছতা মিলেমিশে গেল। এটা যেন শুধুমাত্র একটা কাহিনী নয়—ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক অনির্দেশ্যতায় উধাও মন যেন একটা শক্ত, বাস্তব ভূমি পেল। অসীমের সঙ্গে সীমা-র এই যে মিলনসাধন তাঁর নিজের জীবনে ঘটল—পরবর্তীকালে এই ব্যাপারটিই তাঁর অনেক কবিতা এবং নাটকের মূল বিষয়গুলির একটি হ'য়ে উঠেছিল। কতভাবেই না তিনি জানালেন—"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয় / অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় / লভিব মুক্তির স্বাদ"।

তিন

সামঞ্জস্যধর্ম—এই ধারণাটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন বিশ্বস্ত। মহাকবি কালিদাসের রচনাগুলির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসাবে তিনি বারে বারে উক্ত ধর্মের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। এ ধর্ম মানুষকে ভারসাম্য বজায় রাখতে শেখায়। যেমন সার্কাসের তারের ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটে ; দুদিকে সমান ঝোঁক দিলে, তবেই সে পতন থেকে বাঁচে—ঠিক তেমনই। এ ধর্ম বলে, জীবনে কোথাও বাড়াবাড়ি কোরো না, অতিরিক্তের পথে যেও না। বস্তুত অতিরিক্ত শব্দের মধ্যেই তো 'অতি রিক্ত' এই বিশেষণ প্রকাশ পাচ্ছে। একটা ফুলের সবকটা পাপড়ি সামঞ্জস্যময় অবস্থানে থাকলে ফুলটা যেমন দেখতে ভালো লাগে—জীবনের ক্ষেত্রেও সে-ই একই কথা। কোনো প্রবৃত্তির আধিক্য ঘটলে এই সুসমঞ্জস

অবস্থান নষ্ট হ'য়ে যায়। যদি জীবনে নিরাসক্তিকেই কাম্য মনে করে, মনের অপর সব বাসনাকে সবলে দমন করা হয়—তাহলে একদিন চিত্তে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নিরাসক্তিই তখন আর একটি প্রবৃত্তি হ'য়ে ওঠে। তাই মানুষকে আয়ত্ত করতে হয় ভারসাম্যর মন্ত্র।

এ মন্ত্রের অভাবে কি হ'তে পারে, তা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'বাঁশরী' নাটকে—"প্রকৃতি রঙীন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাতলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে সত্যবোধের চেয়ে বেশী সত্য বলে ভুল হয়। ...সন্ন্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তারপর প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যক্ষ অক্ষরের উপরে দিতুম কালির আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু করতেই চায় উল্টো মন্ত্রে।"—জাদুমন্ত্র থাকলেই তার কাটানমন্ত্রও আছে। তখনই মোহ কাটে, ঘোর ভাঙে।

রবীন্দ্রনাথের দু-একটি নাটকে বা উপন্যাসে দেখতে পাই, এই মোহমুক্তি উপলক্ষে একটি বালিকার আগমন ঘটেছে। যেমন 'রাজর্ষি'র হাসি, 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-র অনাথা বালিকারূপিণী 'সরস্বতী', প্রকৃতির প্রতিশোধ-এ 'রঘুর কন্যা'। এরাই নায়ক চরিত্রের সত্যোপলব্ধির সহায়িকা হ'য়ে উঠেছে। সম্ভবত এদের নিষ্পাপ হৃদয়, সরল প্রশ্ন দর্পণের কাজ করেছে, যে দর্পণে নিজেদের মলিন প্রতিবিম্ব দেখে, তবে মানুষ আপন ভুলের নিরসনে প্রবৃত্ত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী—এই আয়নায় যখন নিজেকে দেখতে পেলেন, তখন আবছাভাবে বুঝলেন, যে, সন্ন্যাসীর নিরাসক্তির চাইতেও 'আমি সন্ন্যাসী'-এই অহংকৃত বোধটিই তিনি প্রধানত সিদ্ধি হিসাবে লাভ করেছেন; সংসারের মোহ থেকে মুক্ত হলেও, সংসার যে ছলনাময় এবং আমি যে তার ঊর্ধ্বে, এই ধারণার মোহে বন্দী হয়েছেন। এই বন্দীশালা থেকে মুক্তি পাবার মূল্য-ই যেন ঐ বালিকার প্রাণ।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচনা—নাট্যাভিব্যক্তির কিছু কিছু দুর্বলতা এর মধ্যে আছে, কিংবা একটি চরিত্র কীভাবে বিপরীত দিকে মোড় নিচ্ছে — এ ধরনের অবস্থা সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্ণনার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু অবিশ্বাস্যতাও (পাঠকের পক্ষে) আছে। এমনকি কাহিনীসূত্র জানা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো মনে হয় যে, এ সন্ন্যাসী বড় চঞ্চল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কিন্তু কয়েকটি প্রশংসনীয় বিষয়ও আছে। যেমন :

১. গদ্যনাটকে পরিস্থিতি নির্মাণ দক্ষতা

২. মাঝে মাঝে চমৎকার উপমা প্রয়োগ

৩. একটি চিরকালীন সমস্যাকে ছুঁয়ে যাওয়া

৪. সীমার মধ্যেই অসীম আছে—এই তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ, পরবর্তীকালে যার আশ্রয়ে বহু কবিতা এবং নাটক রচিত হয়েছে। এ যেন রবীন্দ্র মানসের ভবিষ্যৎ বিচরণের পথ-রেখা।

১. পরিস্থিতি তৈরি করা খুব সহজ কথা নয়, বিশেষ করে কবিভাবাপন্ন নাট্যকারের রচনায় কাব্যের আধিক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে অর্ধবিকশিত

চরিত্রগুলিকে দিয়ে চমৎকার দৃশ্যনির্মাণ করেছেন। যেমন :

ক) দ্বিতীয় মালিনী....(কাছে গিয়া গা ঘেঁষিয়া) মর্ মিন্‌সে, গায়ের উপর পড়িস কেন?

সেই লোক। গায়ে পড়ে ঝগড়া কর কেন! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

দ্বিতীয় মালিনী। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক। না হয় একটু কাছেই আসতে! খেয়ে ত ফেলতুম না।

খ) স্ত্রী। দেখ্ দেখি, মিশ্রদের বাড়ীর ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট। দেখলে দু-দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে—আর এঁদের ছিরি দেখো-না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাতকুলে কেউ নেই, যেন সাতজন্মে খেতে পান না।

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা। আমাদের দোষ কী?

.....আমাদের রঙ কালো তা আমরা কী করব?

মা। তোদের রঙ কালো কে বললে? তোদের রঙ মন্দ কী?

—সন্তানের মুখের একটু ক্ষুব্ধ কথা শুনলেই 'স্ত্রী' অমনি 'মা' হয়ে যান।

গ) স্ত্রীলোক।...পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেস পড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ওদিকে যে একবার পায়ের ধূলো পড়ে না।

ব্রাহ্মণ। —আর ভাই বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

—সাধারণ কথার মধ্যেও কীভাবে বুদ্ধির দীপ্তি সঞ্চার করে দিতে হয়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই কৃতিত্বের দাবিদার হ'য়ে উঠছেন।

২. উপমা প্রয়োগের ব্যাপারে অবশ্য 'উপমা রবীন্দ্রনাথস্য' বলা যাবে না। তবু উপমাকে শুধুমাত্র নাট্যদেহের অলঙ্কার করেই রাখেননি, তার মধ্য দিয়ে একটা বক্তব্য, একটা অনুভব প্রকাশ করেছেন। যেমন, সন্ন্যাসী যখন বলেন—

"চারিদিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা"

তখন উপমান-উপমেয়—এসব আলোচনা ছাপিয়ে অনুভব করা যায় যে, সাধারণ জগৎ ও জীবন তাঁর দৃষ্টিতে কত তুচ্ছ হয়ে গেছে।

আবার এই তুচ্ছ জগৎ যখন আপন সৌন্দর্যে তাঁকে মোহিত করে, তিনি বলেন—

"পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের মাঝে যেতেছে মিলায়ে।"

তখন আমরা তাঁর চোখ দিয়ে দৃশ্যটি দেখতে পাই—এবং মনে হয় যেমন সূর্যের লাল আলো, আকাশের নীলিমা—এদের বর্ণ ও চরিত্র আলাদা—তবু মিলে যেতে কোনো বাধা নেই, তার ঐ নিরাড়ম্বর মিলন মনে কেমন যেন একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। এই মানসিকতা আরো অগ্রসর হয়, যখন বালিকার স্পর্শ সন্ন্যাসীর প্রীতিকর মনে হয়, এবং সে প্রীতি তিনি প্রকাশ করেন এইভাবে—

"আহা তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।"

এই উপমাগুলি সবই নাটকের প্রয়োজনে এসেছে, তবু নাটক-নিরপেক্ষভাবেও সেগুলির পৃথক সৌন্দর্য আছে।

৩. খুব মৃদুভাবে হ'লেও চিরকালীন অচ্ছুৎ সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করে গেছেন। মানুষ যদি দয়াবান, ক্ষমাশীল হয়ও, তবু পিতার ধর্মভ্রষ্টতার দোষ কন্যার কাঁধে চাপিয়ে, তাকে মানসিক নির্যাতন করতে দ্বিধা করে না। অনার্যা চণ্ডালিকার কাছেও এক সন্ন্যাসী গিয়েছিলেন, তিনি তার মনকে যেন একটা সুউচ্চ প্রস্তরখণ্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই রঘুর কন্যা, যে সকলের কাছ থেকে ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা পেয়েছে, সন্ন্যাসীর কাছে গৃহীত হ'য়ে তাকে পিতা সম্বোধন করে সে যত সম্পর্ক গড়তে চাইল, সন্ন্যাসী তত বাঁধন ছিঁড়তে চাইলেন। বন্ধনমুক্তির তত্ত্ব তাঁর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি — তাই তাঁর বন্ধনকে এত ভয়। বারে বারে বালিকাকে তিনি ইচ্ছাকৃত রূঢ়তার দ্বারা বিদ্ধ করেছেন, এবং শেষকালে বালিকার স্নেহের লতাটি ছিঁড়ে টুকরো করে বিদায় নিয়েছেন। সেই মুহূর্তে ঐ বালিকার বিস্ফারিত চোখদুটি আমরা যেন দেখতে পাই। জনগণ ঐ বালিকার প্রতি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল, সন্ন্যাসী তা ছাপিয়ে গেলেন। অন্যলোকেরা ব্যবহারে যেমন, তিনিও তেমন—মেয়েটিকে মানুষ হিসেবে গণ্যই করলেন না। এরপর যদিও পশ্চাত্তাপের অংশ আছে, তবে তখন তো মেয়েটি সব আদর-অনাদরের ঊর্ধ্বে!

৪. সীমা-অসীমের মিলনসাধনের কথা, যা এখানে প্রথম দেখা গেল, তা পরবর্তীকালে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে বারে বারে দেখা গেছে। যেমন 'ডাকঘর', 'রাজা'। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেই মাটিটা যেমন সত্য, তেমনি আমি ঐ অনন্ত আকাশে মুক্তি চাই—আমার এই বাসনাটাও সত্য। এ দুই-ই পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। তাছাড়া হৃদয়বৃত্তিকে নিরোধ করে, দুঃখকে এড়িয়ে, সংসার থেকে দূরে গিয়ে মানুষ যথার্থ মুক্তির অধিকারী হয় না। সুখদুঃখকে সমানভাবে দেখে, সংসারের প্রতি প্রেম এবং কর্তব্যের সামঞ্জস্য রেখে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতিকে মিলিয়ে নিয়ে তবে মানুষ চরিতার্থ হয়। যদি হৃদয়কে উপবাসী রেখে কেবলই জ্ঞানের চর্চা করে যাই, তাহলে এ ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া একদিন কোনো না কোনোভাবে দেখা দেবেই।

আরও একটা কথা। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতি মানবের দিকে। তাকে লঙ্ঘন করলেও, প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য ভবিতব্য হ'য়ে ওঠে।

একটা নাটক অভিনেয় হ'য়ে উঠতে পারে দু'ভাবে। প্রথমত চরিত্রগুলো এত মনোযোগ দিয়ে আঁকা হবে, যে, সেগুলির গভীর পর্যন্ত উন্মোচিত হবে। দ্বিতীয়ত চরিত্রসৃষ্টি নিপুণ না হ'লেও চরিত্রগুলিকে এমন জটিল ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে যে দর্শকের মর্মমূলে নাড়া পড়বে। খুব দক্ষভাবে না হ'লেও, এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই আলোচ্য নাটকে রয়েছে। ঐ সময়ে অন্য যেসব নাটক লেখা হচ্ছে (যেমন ১৮৮২-তে 'আনন্দ রহো'—গিরিশচন্দ্রের লেখা), তার থেকে এ নাটক অনেক আলাদা। আমাদের যে নাট্য অভ্যাস, তাকে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ বদলে দিতে চেয়েছিলেন। পরে দেখা গেছে, তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে, সকল অভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার দায় বারে বারে বহন করেছেন তিনি। নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনেও সমস্ত ধারাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত

নিজস্বতা খুঁজে নিতে চেয়েছেন—গীতিনাট্য দিয়ে শুরু পঞ্চাঙ্ক নাটক, কবিতা, গান এবং গদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে তিনি করেছেন কাব্যে ও নাট্যে মিলিত। আর তার সঙ্গে কয়েকটি গানও আছে।

আলো-অন্ধকারের একটি তাৎপর্যময় ব্যবহারও তাঁর অনেক নাটকে আছে, যেমন এখানেও। চোখ আমাদের অনেকসময় প্রতারণা করে, তাই গভীর ধ্যানের জন্য চাই অন্ধকার—যাতে মনের মধ্যে একনিষ্ঠতা আসে। কিন্তু কখনো কখনো উদ্দেশ্য ভুল থাকে, তাই যথার্থ সিদ্ধিও আসে না। ঐ অন্ধকার তখন ভ্রম হ'য়ে মনকে গ্রাস করে। মানুষকে এড়িয়ে বাঁচা যায় না, নির্লিপ্ত হয়েও নয়—সন্ন্যাসীর এই বোধোদয় হচ্ছে এক ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত রাত্রির পরে—এক অরুণোদয় মুহূর্তে।

রচনাকালের পর শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত, তবুও এ নাটকটি এখনো প্রাসঙ্গিক লাগে। এখনো আমরা প্রকৃত বৈরাগ্যের প্রকৃতি জানি না, এখনো আমরা জীবনকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখে ভালো-তে অতি উল্লসিত ও মন্দে অতিকাতর হই, আমরা প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সময়ে প্রতিক্রিয়া বিষয়ে উদাসীন থাকি, এখনো আমরা অচ্ছুৎদের হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারিনি। ঐ সন্ন্যাসীরই মত নানাপ্রকার ভুল ধারণার জগতে আমরা বাস করছি—হয়তো কোনো এক অরুণোদয় মুহূর্তে আমরা ফিরে পাব আমাদের বাঞ্ছিত সামঞ্জস্যের বোধ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

রবীজীবনী (প্রথম খণ্ড)	—	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্ররচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	—	বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী পত্রিকা	—	বর্ষ ৩০, সংখ্যা ১
ঐ	—	নবপর্যায় ৪
ঐ	—	নবপর্যায় ৪
ঐ	—	বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১
মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ	—	নিত্যপ্রিয় ঘোষ
কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ	—	শঙ্খ ঘোষ
রবীন্দ্র নাট্যপরিচয়	—	শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)	—	সুকুমার সেন
রবীন্দ্রনাথ	—	সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ	—	প্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা	—	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বেদনাদীর্ণ মহাপ্রাণ : শরৎচন্দ্র

বেদনা মানুষের জীবনের এক অতি পরিচিত স্বাভাবিক অনুভূতি—এমনকি, সদ্যোজাত শিশুরও আছে কষ্টের বোধ। সেই নবীন শৈশব ছাড়িয়ে মানুষ যতই বড় হতে থাকে, ততই হাসিকান্নার উপাদানে ভরা জীবনের সঙ্গে তার নিত্যসম্পৃক্তি ঘটতে থাকে। আর জীবনকে ছাড়িয়ে মানুষ যখন শিল্পের দিকে তাকায়, তখন দেখে, জীবনের স্বাভাবিক (এবং কখনো কখনো বা অস্বাভাবিক) চিত্তবৃত্তিগুলিই ঠাঁই পেয়েছে চিত্রকরের তুলিতে, সাহিত্যিকের লেখনীতে, ভাস্করের ভাস্কর্যে। আনন্দের পাশাপাশি দুঃখের কথা, যন্ত্রণার কথাও সেখানে সগৌরবে প্রকাশ পায়। এমনকি, Shelley তাঁর 'To a skylark' কবিতায় জানিয়েছেন—"Our sweetest songs are those, that tell of saddest thought." আরো অনেক কবিই মনে করেন যে আনন্দ ও বেদনার মাঝে দ্বিতীয়টিই বরণীয়তর অনুভব। আর যাঁরা তা মনে করেন না, তাঁরাও জীবন-রূপায়ণের ক্ষেত্রে আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'শোক' তথা দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে গৌণ কিংবা মুখ্য স্থান দেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে দু'টি বিশেষণ আমরা বারবার শুনে থাকি—তিনি 'দরদী কথাশিল্পী' এবং 'মরমী কথাশিল্পী'। 'দরদী' এই অর্থে, যে, মানুষের জীবনে যখন বেদনায় দীর্ণ হয়ে যাবার পরিস্থিতি আসে, তখন তার রূপায়ণে শরৎচন্দ্র নিরপেক্ষ থাকেন না, তাঁর সহানুভূতি, এবং সে সহানুভূতি কার বা কাদের প্রতি—তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মরমী' বোধ হয় এইজন্যেই বলা হয়, তিনি মানুষের মর্মকথার দোসর। আসলে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে, স্বসৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের মতই পরের দুঃখে তার পাশে দাঁড়াবার অভ্যাস তাঁর আকৈশোর। এমনকি, একবার তাঁর বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কিছু শখের রঙিন পাথর (যা তালাচাবির মধ্যে থাকত) বিক্রি করে তিনি অন্যদের সাহায্য করেছিলেন—এবং এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর স্বভাবশান্ত পিতা তাঁকে এমন রূঢ় ভর্ৎসনা করেছিলেন যে, শরৎ ভাগলপুর থেকে চলে যান। পিতার সঙ্গে তাঁর ইহজীবনে আর দেখা হয়নি। এ ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এ-ই যে, শরৎচন্দ্রের মনোভাবটা এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তদুপরি এটাও বোধ হয় তাঁর ভাগ্যেরই বৈশিষ্ট্য যে, জীবনের প্রথম অংশটা তাঁকে একেবারে যাযাবরের মত কাটাতে হয়েছে—কিছুদিন এখানে, কিছুদিন ওখানে—এই স্কুলে, ওই স্কুলে—ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশে পর্যন্ত। আবার একথাও মানতে হবে যে সাধারণ লোকের কাছে এ জীবন দুঃখের, কিন্তু একজন ভবিষ্যৎ শিল্পীর কাছে, প্রকারান্তরে আনন্দের। কত জায়গা, কতরকম মানুষ দেখবার, কতরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নেবার এমন সুবর্ণ সুযোগ তো সবাই পায় না। তো, এই জীবনে নানারকম দুঃখের স্বাদ পেতে হয়েছিল শরৎচন্দ্রকে। নিজের পিতার জীবনে দেখেছেন ঘরজামাই হয়ে অসম্মানের মধ্যে থাকার বেদনা—যা পরে রূপ পেয়েছে 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয় ডাক্তার চরিত্রের মধ্যে। মামার বাড়িতে অশ্রদ্ধার মধ্যে বড় হবার যে কষ্ট, তা রূপ পেয়েছে 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে। রেঙ্গুনে পৌঁছে কোয়ারানটাইনে যখন তাকে যেতে হয়েছে, তখন সে যেমন কষ্টও পেয়েছে, আবার অভিজ্ঞতার ঝুলিও ভরে নিয়েছে। এগুলি

হ'ল দুঃখেরই নানাপ্রকার মাত্রা—কেউ কষ্টপ্রাপ্তি-টা বড় করে দেখে, আবার কারোর কাছে নতুন অনুভূতিটাই কাম্য। একবার তিনি রেঙ্গুন থেকে বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমার সমস্ত দুষ্কৃতি ভুলিয়া সবটুকু স্নেহের চক্ষে পড়িয়ো ভাই...পুঁটু, বড় হতভাগ্য জীবন আমার। এমন অর্থহীন নিষ্ফল নীরস দিন, মাস ও বৎসরের সমষ্টি যে কেন মাথায় বহিয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধি যদি দিয়াছিলেন, একটু সুবুদ্ধি দিলেই তো পারিতেন। যদি না দিলেন তো এত ভালবাসিতে শিখাইয়া দিলেন কেন?....আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই—এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে? সাধু সাজিতেছি না ভাই—এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না—কিন্তু তোমরা তো ভাল, তবে তোমরাই বা এত নিষ্ঠুর হইলে কেন?..." ইত্যাদি।

এই মর্মভেদী চিঠিখানি শরৎচন্দ্রের জীবনে নিঃশব্দে বেদনাসহনের চিত্র আমাদের সুমুখে এনে দেয়। কবিকে যে কবির লেখার মধ্যেই পাওয়া যায়—এ আপ্তবাক্যে ক্রমশ বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করে।

দুই

যেমন হাসির, তেমনি দুঃখেরও অনেক প্রকারভেদ আছে। প্রিয়জনকে হারাবার দুঃখ, অসহায়ভাবে সন্তানকে মৃত্যুর কোলে তুলে দেবার নিরুপায় দুঃখ, দুর্বলের ওপর প্রবলের নিষ্ঠুরতাজনিত দুঃখ, পাশাপাশি থেকেও দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্ট হবার দুঃখ—এমনি নানারকম। কোথাও চরিত্র, কোথাও সামগ্রিক পরিস্থিতি এইসব দুঃখের কারণ হিসাবে উপস্থিত। মানুষের জীবনে এই দুঃখগুলি নানারূপে নানা পথ ধরে আসে। কথাশিল্পীর কথাশিল্পেও তা-ই। আমরা সেদিকেই এবার তাকাবো।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, বড়গল্প, উপন্যাস সংখ্যায় অনেক—এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বহুখ্যাত ও বহু আলোচিত। পাঠকও হয়তো বা সেগুলি বার বার পড়েছেন এবং চোখে জল এসেছে। কখনও সমালোচক চুলচেরা বিশ্লেষণে নির্দেশ করে দিয়েছেন ট্রাজেডির কারণ। প্রায় সকলেই তা জানেন।

তাই, এগুলির কথা থাক। অন্যগুলির দিকে তাকানো যাক। প্রথমেই, মনে পড়ে, 'পথনির্দেশ'-এর গুণীদাদাকে। হেম তার আকস্মিক হঠকারিতার (প্রসঙ্গত বলা ভালো যে, আকস্মিকতা শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রচুর পরিমাণে আছে এবং অনেকসময় ঐ 'অকস্মাৎ' ব্যাপারটাই দুঃখের জনক) বশবর্তী হয়ে গুণীর মনের কোমল অনুভূতিটিকে যেন মাড়িয়ে দিয়ে বলে—

"আমি সমস্ত বুঝেছি। হা অদৃষ্ট! যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক। শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও।"

গুণী এতক্ষণ একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়াছিল. তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল ; উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ছিঃ হেম, বুঝে কথা কও। ও কি বলচ?"

হেম তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বুঝেই বলছি। তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা বলচ, আমি স্পষ্ট করে তোমার মুখের সামনেই তা বলি। তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও।"

—এর পরে গুণীর মনের অবস্থা কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

একই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত দেখি 'দেবদাস'-এ, যখন দেবদাস পার্বতীকে প্রথম যে চিঠিখানি লিখল, তাতে উল্লেখ করে দিল যে প্রথমত পার্বতীদের ঘর নিচু, এবং দ্বিতীয়ত সে যে পার্বতীকে ভালোবাসে তা তার কোনোদিন মনে হয়নি। উপন্যাসের এই অংশ পর্যন্ত পাঠের পর অবশ্য আমরাও দেবদাসের সঙ্গে একমত যে, সে সত্যিই পার্বতীকে ভালোবাসেনি। কারণ প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে উঁচু ঘর—নিচু ঘরের প্রশ্ন আসে না। কিন্তু—"পত্রখানা...রওনা করিবার পরমুহূর্ত হইতেই অন্য কথা ভাবিতে লাগিল।....সে ভাবিতেছিল ঐ ঢিলটা তাহার মাথায় কীভাবে পড়িবে? খুব লাগিবে কি? বাঁচিবে ত?"

—এই যে চিন্তা শুরু হল, তা তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। এ চিঠি পেয়ে শুধু পারু-র দুঃখ নয়, এ চিঠি দিয়ে দেবদাসেরও দুঃখ। পরে যে দেবদাস বলেছে—

"বেশী ভেবেচিন্তে কাজ করতেও পারিনে। যখন যা মনে হয় করি।"—এইটেই খাঁটি কথা। আর এখানেই রয়েছে বেদনাবৃক্ষের বীজ।

আমাদের সেকালের যৌথ পরিবারে অত্যল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা রমণীরা কি প্রকার সংকীর্ণতায় ভুগতেন, শরৎচন্দ্র সেসব খুব ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন—আর সেগুলির প্রকাশে তাঁর যথার্থ বস্তুদৃষ্টিও ছিল। এইরকম দু-একটি নমুনা হ'লেন পল্লীসমাজে রমার মাসি এবং অরক্ষণীয়াতে জ্ঞানদার জ্যাঠাইমা স্বর্ণমঞ্জরী। রমার মাসি তাঁর ধারালো জিহ্বার শক্তিতে রমেশকে প্রায় ভূমিসাৎ করে দিয়েছিলেন। আর জ্ঞানদার জ্যাঠাইমা স্বর্ণ যেন স্বয়ং সমাজবিধি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন—মেজবউ দুর্গামণিকে তিনি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করাতেন যে জ্ঞানদাকে 'পার করা' কত জরুরি, ছোট দেবর অনাথকে বোঝাতেন যে 'মাধুরী মায়ের জন্য অতুলই যোগ্য পাত্র', আর জ্ঞানদা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—

"তোমার ঐ ডানাকাটা পরীর বিয়ে দিতে আমরা পারব না....তা সত্যি কথা বলব মেজ বৌ—যেমন তোমার মেয়ের ছিরি, তেমনি গিয়ে হরিপালে পোড়ে-হোড়ে থেকে যা-হোক একটা চাষা-ভূষো ধরে দাও গে—ন্যাটা চুকে যাক। শুনেছ নাকি—সেখানকার লোক সুচ্ছিরি কুচ্ছিরি দেখে না—মেয়ে হলেই হ'ল।"

জ্ঞানদা সম্পর্কে তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণগুলি হল 'ঘরের মড়া', 'হতভাগী', 'শতেকখাকী', 'বাঁদরী', 'খানকির বেহদ্দ', 'কালামুখী'—এবং আরো কিছু অশ্রাব্য শব্দসম্ভার। এগুলি যার উপর বর্ষিত হত, তার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানদাকে সমাজ রক্ষা করে না, গুরুজনেরাও রক্ষা করেন না। সে যথার্থই অরক্ষণীয়া। আর এ কাহিনীটি যখন জ্ঞানদার দৃষ্টিতে দেখি, তখন স্বর্ণমঞ্জরীর উপরোক্ত গঞ্জনার চাইতেও মা দুর্গামণির কঠিন পদাঘাত যে তার কাছে ক্রূরতর ছিল, সেইটে বুঝতে পারি। বিবাহের পণ্যশালায় যখন সে নিজেকে বেচবার প্রয়াস করে, তখন পাঠকের পক্ষে সেটি দুঃসহ আঘাত। আর একেবারে শেষে, যে অতুল জ্ঞানদাকে প্রতারণা করেছিল, সে-ই করুণা পরবশ হ'য়ে জ্ঞানদাকে বিবাহ করতে চায়—তখন সেটি বোধ হয় জ্ঞানদার প্রতি লেখকের কঠিনতম আঘাত। জ্ঞানদার পক্ষে

এখন সর্বাধিক শক্ত অতুলের গৃহিণী হওয়া—অথচ এই সমাজে বাঁচতে হলে আর পথ নেই। এইরকমই আর এক দুঃখী বিধবা জ্ঞানদাকে পাই 'বামুনের মেয়ে'-তে। সমাজ তাকে রক্ষা করেনি, সমাজপতি তাকে ছেড়ে কথা বলেননি। অতএব সমাজের মধ্যে যে জায়গাটুকুতে তার অবস্থান, সেটা তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দিয়ে, কোথায় যাবে, সে কথাটা কেউ স্পষ্ট করে বলে না। তখন ছিল দুটো মাত্র যাবার জায়গা—কাশী আর বৃন্দাবন (এখনও আছে)। যাদের কোনো সামাজিক পরিচয় নেই—তাদেরই কোনোমতে, হয়তো বা ছদ্মপরিচয়ে বেঁচে থাকার স্থান। বৃন্দাবনকে ভালবেসে আর বৃন্দাবনে থাকতে যেত কজনেই বা! জ্ঞানদারও শেষ আশ্রয় হল সেইটি। এ উপন্যাসে আছে আরো কয়েকটি দুঃখী চরিত্র, যেমন সন্ধ্যা। কৌলীন্য প্রথার কুফলে অজ্ঞাতসারেই তার জীবন জন্মলগ্নে অভিশপ্ত হয়ে গেছে। আছেন প্রিয় ডাক্তার—এবং তাঁর জীবনবৃত্তান্ত পূর্বোক্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। তাঁদের দুজনের জন্যও রইল বৃন্দাবন। তবু তো সান্ত্বনা যে, পিতাপুত্রী অন্তত একসঙ্গে রইলেন—সামাজিক সম্পর্ক সব ছিঁড়ে টুটে যাক—রক্তসম্পর্কের একজন তো তবু পিতার প্রতি ভালোবাসা নিয়ে সঙ্গে চলল। এই অংশের পরোক্ষ বর্ণনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সংলাপ অংশটি উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে যে শরৎচন্দ্র দুঃখের বর্ণনায় কতখানি রসসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন—

"—বাবা—

—কে? সন্ধ্যা? এই যে মা, যাই চলে—আর দেরী হবে না—

—কি করছিলে বাবা?

—আমি? কৈ না,—কিছুই ত নয় মা!

—ওতে কি বাবা? কি রাখছিলে?

—গোটাকতক—বেশি নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিচ্ছিলাম, আর ঐ মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয়, ছোটটা—ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে—অচেনা জায়গা, যা হোক একটু প্র্যাকটিস করতে ত হবে! তাই ভাবলাম,—

—মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

....

—না মা, আর আমি কাউকে জড়াতে চাই নে। আমার জন্য তোমরা অনেক দুঃখ পেলে, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।"

আযৌবন পরিচিত স্থানের সংকীর্ণতা তো দেখা হয়ে গেছে। এখন অচেনা জায়গা বৃন্দাবনের ঔদার্যের ওপরেই ভরসা। এই অংশটিতে কোনো অশ্রুপাত বেদনার কাঠিন্যকে তরল করে দিতে পারেনি।

আর প্রিয় ডাক্তারের স্ত্রী জগদ্ধাত্রী? তাঁর ক্ষোভ আছে—তাঁকে প্রতারণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বামী, সন্তান যাঁর চলে যায়—শূন্য সংসার এবং কুলের মর্যাদা নিয়ে তিনি কি করবেন? একটা অন্তরালবর্তী প্রশ্ন কি এবার তাঁর মনে জাগবে না, যে, বংশমর্যাদা তথা সামাজিক কৌলীন্য বড়? নাকি প্রিয়জনেরা? এর উত্তর তিনি যেভাবে খুঁজে পাবেন, তার ওপরেই

নির্ভর করছে তিনি দুঃখ পাবেন, নাকি স্বস্তি।

সমাজের এইসব নিগড়ে কষ্ট পাওয়া আর একটি বিধবা মেয়ে রমা-র কথাও এইসূত্রে মনে পড়ে যায়। রমেশের প্রতি রমার অধিকাংশ ব্যবহার স্মরণ করিয়ে দেয় গোপন প্রেমের ত্রস্ত পদপাতকে—যাকে সওয়াও যায় না, বওয়াও যায় না। সমাজ যেন সার্কাসে খেলা দেখাবার একটি তার। যে ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে ঐ তার থেকে পড়ে গেল, তার পতনটাই সত্য বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। তাই যথারীতি, রমারও লক্ষ্য কাশী। সন্ধ্যা-প্রিয় ডাক্তার-জ্ঞানদা-রমা সকলেই এমন এক পথে পা দিয়েছে—যে পথ আসলে কোথাও পৌঁছেছে কিনা কেউ জানে না। এরা 'চরৈবেতি' মন্ত্রের সাধকও নয়, সংসার ছেড়ে চলে যেতে এদের বুকের শিরা ছিঁড়ে যায়—তবু কেউ এদের ধরে রাখে না। প্রসঙ্গত, নিমেষের জন্য মনে পড়ে যায় 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের শেষাংশ, যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী উপীন সাবিত্রীকে বাধ্যতামূলক ঔদার্যের শিক্ষা দিয়ে যায়—

"আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্যে নয়, সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতর যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।"

—এমন সাংঘাতিক অনুরোধ খুব কমই শুনেছি আমরা। দুর্ভাগ্য যাকে কুলের বাইরে একবার আনল, সে যেন "সংসার জীবনের যোগ্য নয়" এই ছাপের দ্বারা চিহ্নিত হ'য়ে গেল। সাবিত্রীর জীবনে দুর্ভোগ তো ছিলই, দুর্ভাগ্য এ-ই, যে, সে তার উপীনদার কথা মেনে নিয়ে নিজের বাসনাকামনার সমাধি নিজেই দিল। গভীর দুঃখ যে মানুষের চোখের জল শুকিয়ে দিতে পারে—এ অংশটি তার একটি নমুনা। সাবিত্রীকে আর কষ্ট করে কাশী কিংবা বৃন্দাবনে যেতে হল না—সে সংসারে থেকেই অকূল উদ্দেশ্যহীনতায় তার জীবনকে ভাসিয়ে দিল।

তিন

স্নেহপ্রার্থী জনের স্নেহ না পাবার করুণ কাহিনী শরৎসাহিত্যে বহু ব্যবহৃত একটি বিষয়। সাধারণত এরা বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়া কিশোর। যারা না-বড় না-ছোট। যারা ছোটদের সারল্যের কাল পেরিয়ে এসেছে অথচ বড়দের পরিণতি পায়নি—যারা দুষ্টুমি করলে 'বালকোচিত' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—এরা-ই তারা। দুজনের কথা তো সকলেরই মনে পড়বে—রাম আর কেষ্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে ফটিকের পাশে হাজির ছিলেন এক স্নেহহীনা মামী—ঠিক তেমনি এদের পাশেও দুই কঠিনহৃদয়া আছেন—তাঁরা যথাক্রমে দিগম্বরী এবং কাদম্বিনী। ফটিকের তুলনায় দুজনেই অবশ্য ভাগ্যবান, কারণ তারা যথাক্রমে নারায়ণী ও হেমাঙ্গিনীকেও পেয়েছে। নারায়ণী বাল্যকাল থেকে মাতৃহারা দেবর রামকে বড়ো করেছেন, তাই মায়ের মতো ধৈর্যে তার সব দুরন্তপনা সহ্য করেন। যখন নানা কারণে রামকে পৃথগন্ন করে দেওয়া হয় তখন রামের কাছে ব্যাপারটা এইভাবে প্রতিভাত হয়, যে, বৌদি আর তার তত্ত্বাবধান করবে না। এটা তার পক্ষে এত অপ্রত্যাশিত এবং এত বেদনার যে, তার চিরাভ্যস্ত দুরন্তপনা স্তব্ধ হয়ে গেছে এবং বৌদিকে খুশী করার জন্য 'বাবার থানের ওদিকে কোথায় মামার বাড়ি আছে'—সেই অনির্দিষ্ট স্থানে চলে যেতে চেয়েছে। একজন

বড়ো লোকের কাছে হয়তো এটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার—কিন্তু যখন রামের দিক থেকে কাহিনীটি দেখি—তখন তার ভরসাহারা মনটিকে দেখতে পাই। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, যে, গত দুদিন যাবৎ বৌদি তাকে ডাকেনি, বকেনি, খেতে দেয়নি। যে একবার স্নেহের আস্বাদ পেয়েছে, তা থেকে বঞ্চিত হলে তার যে বেদনা, তা কোনো মাপকাঠিরই আয়ত্তে নয়। শরৎচন্দ্র 'মেজদিদি' গল্পে একটি দামী কথা বলেছিলেন—

"আঘাত যতই গুরুতর হউক, প্রতিহত হইতে না পাইলে লাগে না। পর্বতশিখর হইতে নিক্ষেপ করিলেই হাত পা ভাঙ্গে না, ভাঙ্গে শুধু তখনই যখন পদতলপৃষ্ঠ কঠিন ভূমি সেই বেগ প্রতিরোধ করে।"

কথাগুলি কেষ্ট-র প্রসঙ্গে বলা, যে কেষ্টর ভাগ্য রামের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। শান্ত, লাজুক কিশোরটি বাধ্য হয়ে এসে পড়ল সৎদিদির আশ্রয়ে। এতদিন, একটু বেশি করে খেলে মা খুশী হত—আর এবার, স্বাভাবিকভাবে খেলেও দিদি বেশি খাবার খোঁটা দেয়। কিশোরটির ভাগ্য যেন তার জীবনকে এক মেরু থেকে বিপরীত মেরুতে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের যে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা—হয়তো তার সাহায্যে কেষ্টও একদিন সৎদিদির বাড়ির দুঃসহ খাটুনি, অকথ্য গালিগালাজ এবং নামমাত্র আহারে অভ্যস্ত হয়ে যেত, যদি না মাঝখানে মেজদিদি হেমাঙ্গিনী এসে পড়তেন। হেমাঙ্গিনীর স্বাভাবিক মাতৃদৃষ্টির কাছে, কেষ্ট যেন তাঁর সন্তান ললিতেরই বয়সী আর একটি ছেলে। এইবারেই কেষ্টর জীবনে কষ্ট নেমে এল। হেমাঙ্গিনী তাকে যত আদরযত্ন করেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে কাদম্বিনীর নিষ্ঠুরতাগুলো তার পক্ষে অধিকতর বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। আসলে বেদনাবোধের বাসস্থান তো স্নায়ুগুচ্ছে নয়, বরং মানুষের মনে। কেষ্ট যতই বুঝতে পারল যে সামান্য অন্নবস্ত্রের পাশাপাশি স্নেহ পাবারও একটা অদম্য চাহিদা তার মনের মধ্যে আছে—ততই সে নিঃশব্দে বিদ্রোহ করতে লাগল এবং শাস্তি পেতে লাগল। কেষ্টর শাস্তি পাওয়া যেন এক দ্বি-ধার তরবারি। তাই কেষ্ট দুঃখ পেলে অনেক বেশি বেদনা পেয়েছেন হেমাঙ্গিনী, বিশেষত যখন তিনি দেখেছেন, তাঁর কাছে আসা-র অপরাধে কেষ্টর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে।

একধরনের বেদনা আছে, যার উপর কোনো সান্ত্বনার প্রলেপ চলে না। তা হল, চোখের সামনে সন্তানের মৃত্যু। এরকম একটি ঘটনাসংস্থান 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে আছে। বালক চরণ সারাদিন রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে ও তার সৎমা কুসুমের কাছে যেতে চেয়েছে। কুসুমকে কেউ জানায়নি। কুসুম যখন এল, চরণ তখন সংজ্ঞাহীন। চরণের বাবা বৃন্দাবন তাকে জানাল—

"আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। আজ সমস্ত দিন যত যন্ত্রণা পেয়েছে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেছে—কি ভালই তোমাকে যে বেসেছিল! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।"

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও নাও গে।

পরদিন সকালবেলা....বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুসুম মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।”

এতক্ষণ যেন কুসুম কায়-মন-বাক্য ব্যাপৃত রেখেছিল শুধু চরণের প্রাণটুকুকে অনুভব করার কাজে—যে চরণ তাকে বড় বেশি ভালোবাসত। চরণ যে ‘মৃতদেহ’ হয়ে গেছে—এই কথাটি শোনার পর তার সারারাত্রিব্যাপী নীরবতা ভেঙে গেল—সে চরণকে জন্ম দেয়নি বটে, কিন্তু সে যেন অর্ঘ্যের মত তার চরণকে মৃত্যুর দেবতার হাতে তুলে দিল। এই মর্মান্তিক দৃশ্যে কোনো সম্মিলিত শোককলরোলের চিত্র আঁকেননি শরৎচন্দ্র। যেন চেয়েছেন, এই শোকের আগুন অনির্বাণ হোক, এই আগুনে চরণের বাবা-মার মধ্যবর্তী সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি, মিথ্যা অভিমান দগ্ধ হয়ে যাক।

একটি শিশুকে ঘিরে অনুরূপ করুণ দৃশ্যের একটি উদাহরণ-এ আছে ‘চন্দ্রনাথ’। বৃদ্ধ কৈলাসবাবু হাতে করে মানুষ করেছেন তাঁর পাতানো নাতি বিশুকে, তার দামাল হাতের নাগাল থেকে প্রাণপণে বাঁচিয়েছেন নিজের শখের দাবার ঘুঁটিগুলো। যখন বিশুর বাবা চন্দ্রনাথ এসে বিশু ও তার মা সরযূকে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি বুঝলেন পাতানো নাতি কবেই আসল নাতি হয়ে গেছে। তাই কৈলাসচন্দ্রের গৃহ মন দুই-ই শূন্য হয়ে গেল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যে দাদুভাইকে দেখার জন্য সর্বদা তাঁর মন অধীর হয়ে থাকত, বিকারের ঘোরে তাকেই সর্বদা দেখতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন

—“বিশুদাদা, আমার মন্ত্রীটা। এবার দে, নইলে মাত হয়ে যাব!

শম্ভু মিশির কাছে আসিয়া বলিল, বাবুজী কি বলছে?

কৈলাসচন্দ্র তাহার পানে একবার চাহিলেন, ব্যস্তভাবে বালিশের তলায় একবার হাত দিলেন....বিশু, বিশ্বেশ্বর! মন্ত্রী হারা হয়ে আর কতক্ষণ খেলা যায়, দে ভাই দে.....।”

কৈলাসচন্দ্রের খেলা অবিলম্বে শেষ হয়ে গেল। এটি কষ্টের কাহিনী বটে, কিন্তু এটি আমরণ স্নেহেরও কাহিনী।

চরিত্রে, ঘটনায়, ভাববস্তুতে—কতরকম পথেই না কাহিনীতে বেদনার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। শরৎচন্দ্র প্রায় সবক'টি সম্ভাবনা নিয়েই নাড়াচাড়া করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে। বলাবাহুল্য, তাঁর বহু বিখ্যাত উপন্যাস ও গল্প আলোচনার পরিধি-র বাইরেই রয়ে গেল—উদ্ধৃতিযোগ্যতায় সেগুলিও যথেষ্ট মূল্যবান। আসলে উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে শরৎচন্দ্রের রসসিদ্ধি প্রমাণ করা তো নিতান্তই নিরর্থক। তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে সর্বরসস্রষ্টা সাহিত্যশিল্পী করে তুলেছে—করুণরসেও তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি আছে। যে বেদনায় চোখের জল পড়ে, তার কথা তিনি যেমন বলেছেন—আবার যেখানে অশ্রুপাতের সান্ত্বনা নেই সে যন্ত্রণার কথাও বলেছেন। ‘দর্পচূর্ণ’ গল্পে দেখেছি স্বামী-স্ত্রী থাকে একই বাড়িতে, কথা বলে একই ভাষায়—অথচ কেউ কাউকে বোঝে না। শুধুমাত্র শান্তস্বভাবের নরেন আরো শান্ত হয়ে যায়। ‘পথের দাবী’র শশীকবি নবতারাকে এত ভালোবেসেও বুঝতে পারে না যে নবতারা তাকে চায় না—শুধু চূড়ান্ত দিনটিতে নবতারাকে ঘিরে গড়ে ওঠা তার স্বপ্নগুলো মিথ্যে হ'য়ে যায়। শশী তখনও বেহালায় সুর তোলে। ‘দেবদাস’-এর

পারু রাতের বেলা দেবদাসের কাছে গেছে সবরকম কলঙ্কের আশঙ্কা ঠেলে ফেলে দিয়ে আর পারুর সেই মনটিকে গুরুত্ব না দিয়ে দেবদাসের একটাই প্রশ্ন—পারুকে কেউ এত রাতে দেবদাসের কাছে আসতে দেখেনি ত? দুটি মনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এখানে সম্পূর্ণ আলাদা। আসলে, এগুলি এক একটি লগ্নভ্রষ্টতার কাহিনী।

যে সুলগ্নে উভয়ে উভয়ের মন বুঝবে—সে শুভলগ্ন ফিরে এসেছিল ইন্দুর জীবনে, কিন্তু দেবদাসের জীবনে আর আসেনি। এখন কে-ই বা কার জন্য চোখের জল ফেলবে, অথবা বুকে লালন করবে অনন্ত হাহাকার। অনঙ্গ ডাক্তারের কবলে অসহায় কিরণময়ীকে দেখেও আমরা দুঃখ পাই—কিন্তু সে-ও যেন এক কুলগ্নের কাহিনী, কারণ সে নিজেই যথাকালে তার কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেদনার কথা আমরা বিশদ করে বলেছি বটে, কিন্তু সে তো শুধু জীবনের একটামাত্র দিক। শরৎচন্দ্র কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনের কথাই বলেছেন। তবে পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থলের মতো মানবজীবনেও আনন্দের তুলনায় বেদনারই আধিক্য।

একটা সময় ছিল, যখন কিছু বিজ্ঞ (!) লোক বলতেন মেয়েরা দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে শরৎ চাটুজ্যের বই নিয়ে পড়ে, আর চোখের জল ফেলে। বক্তব্যটির মধ্যে একটু নাক-উঁচু ভাব আছে, প্রতিবাদযোগ্য কথাও আছে—কিন্তু একটা জিজ্ঞাস্যও থেকে গেছে। এতই যদি কান্নায় ভরা তাঁর লেখা, তবে পাঠক তা বারে বারে পড়েন কেন? তবে কি তার মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য-ই আমাদের আকর্ষণ করে রাখে? এ কথাটাও তো সম্পূর্ণ ঠিক নয়—কারণ 'পথনির্দেশ' উপন্যাসের স্বল্পায়তন প্রথম অধ্যায়ের অতি পরিমিত বর্ণনার মধ্যে আছে—যক্ষ্মারোগে পতিতপাবনের মৃত্যু—সে রাত্রে বর্ষার দুর্যোগ, পরদিন তার সৎকার—তারপর সহায় সম্বলহীনা বিধবা সুলোচনার মাত্র একশ টাকা দামের আম-কাঁঠালের বাগানটির প্রসঙ্গ এবং তেরবছরের অরক্ষণীয়া কন্যা হেম-এর কথা—তারপর বাগান বিক্রি—হেমকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীরামপুর স্টেশনের পথ ধরে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটে গুণেন্দ্রর বাড়িতে পৌঁছানো। এই এতটি বলার কথা তিনি পরমাশ্চর্য নৈপুণ্যে অতি অল্প জায়গায় প্রকাশ করেছিলেন। অথবা 'মহেশ' গল্পের গফুর, সে তার বুকফাটা কষ্ট সংক্ষেপেই প্রকাশ করেছে রাতের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে, বলেছে—"যে তোমার মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর যেন তুমি কখনো মাপ কোরো না।"—এগুলির মধ্যে তো কোনো বাড়াবাড়ি নেই। তবে কেন এগুলির এত পাঠকপ্রিয়তা? আসলে দুঃখের কাহিনীও আমরা যে ভালোবেসে পড়ি, এই আপাত বৈসাদৃশ্যের কারণ হল অপরের বেদনা আমাদের হৃদয়ের সহানুভূতির উৎসমুখ উন্মুক্ত করে দেয়। যে চরিত্রটি আমার আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন কিছুই নয়, সেই সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত লোকটির জন্যও সহানুভূতি বোধ করে আমরা দৈনন্দিন জীবনের স্বার্থপর আমিত্বময় বোধগুলির একটু উপরে উঠতে পারি—কিছুক্ষণের জন্যও নিঃস্বার্থভাবে বেদনাবোধ করতে পারি। তাই তো সাহিত্যে বেদনার এতো মূল্য। তাই তো, কষ্ট পাবো জেনেও করুণরসের কাহিনী বারে বারে পড়ি। সাহিত্যিক Ruskin পঠনীয় গ্রন্থের যে দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন—অর্থাৎ ক্ষণমূল্য এবং চিরমূল্য গ্রন্থ—সেই চিরমূল্যতার দাবি শরৎচন্দ্রের

রচনাগুলি করতে পারে। করুণরসে তাঁর অনায়াস লেখনী চালনা, সেই দাবির একটি ন্যায্য কারণ।

সংসারে যারা শুধু দিয়েই যায়, কিছুই পায় না, যারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত তাদের প্রতি শরৎচন্দ্রের পক্ষপাত সর্বজনবিদিত। তাই চন্দ্রমুখী-বিজলী—যারা সমাজের ঘৃণার পাত্র, তারা শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পায়। অভয়া, রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী, অচলা, সাবিত্রী—এঁরা কেউ চিরশান্তি ভরা জীবন পাননি—এঁদের জীবনকাহিনীগুলি কয়েকটি দুঃখেরই যোগফল, হয়তো মাঝে মাঝে সুখের মুখ দেখেছেন তাঁরা। এঁদের জীবনের বর্ণনাতেই লেখকের আগ্রহ। ঐ সব সুখদুঃখের বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য পরিমিতিবোধ লক্ষণীয়—এমনকি কখনো কখনো দুঃখকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেননি পর্যন্ত। আসলে তাঁর দৃষ্টিটা সমগ্রতার—তাই বেদনায় দীর্ণ হবার ইতিহাসগুলি অনেক সময়ে অব্যক্ত—আবার কখনো বা অর্ধস্ফুট আভাসে ব্যক্ত। তিনি তো সর্বরসস্রষ্টা সাহিত্যিক। মনে হয় এইটেই আসল কারণ, যার জন্য পাঠককুল তাঁর গ্রন্থগুলি একবারের পর দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যয়নেও পরাঙ্মুখ হন না।

একালের সমালোচকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মতামত অভিন্ন নয়। একজন হয়তো বলেন যে তাঁর গল্প-উপন্যাসের আবেদন সার্বভৌম নয়, আবার অপর একজন হয়তো বলেন—"তিনি হতে চেয়েছেন মননশীল লেখক কিন্তু হৃদয়বৃত্তির আধিক্যের জন্য বারে বারে তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা পরাহত হয়েছে।" কেউবা বলবেন—"মানুষের প্রতি দরদ এবং বহতা মানব-সংসার-ধারার বিচিত্র খবরের প্রতি আগ্রহ...এ ছিল তাঁর চরিত্রের ভিত্তি।" এইসব নানা মতামত থেকে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে আসে—মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন —তাই তাদের আনন্দে সুখ এবং বেদনায় দুঃখ পেতেন। এই সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ-ই তাঁর কাহিনীগুলির বেদনাময় অংশগুলিকে কালোত্তীর্ণ করেছে। তিনি কবেই বিগত হয়েছেন, এখনো পাঠক তাঁর লেখাগুলি পড়ে, জ্ঞানদার দুঃখে চোখের জল ফেলে, রমার কষ্টে মূক হয়ে যায়। একনিষ্ঠ পাঠকের তাতেই সুখ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ ১৯৭৬-৭৭, শরৎচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা।
২. ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ—অনুবাদ : দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল (মূল গ্রন্থ—আওয়ারা মসীহা—বিষ্ণু প্রভাকর)
৩. শরৎ সাহিত্য সমগ্র—আনন্দ পাবলিশার্স।
৪. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার—ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৫. Saratchandra Chatterjee, His life and Literature–Narayan Chaudhuri.
৬. সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৮৭, পৃঃ ২২৩-২৩০।
৭. ভারতবর্ষ, ১৬শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃঃ ৪৪৭-৪৫৫।

ইতিহাস, সময় এবং জীবনানন্দ

মানুষের মন, তার চেতনাজগৎ—নিত্য প্রসারণশীল। কারণ, মানবসভ্যতা নিত্যঅগ্রসরমান। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা যত তাল মেলাচ্ছি, ততই খুঁজে ফিরছি অতীত ইতিহাস এবং স্বপ্নে দেখছি এক আলোকদীপ্ত ভবিষ্যৎ। আমাদের দেহটা সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে একটা বিশেষ দেশ ও কালের সঙ্গে, কিন্তু সেই গণ্ডিটা ছাড়িয়ে ইতিহাসের তথা অতীতসময়ের স্রোতের মধ্যে নিজেকে বুঝতে চাইবার একটা অনুসন্ধিৎসাও আমাদের মধ্যে অল্পবিস্তর আছে। জীবনানন্দ আমাদেরই একজন—এই অর্থে। তবে তাঁর অনুসন্ধিৎসা তীব্রতর এবং বোধগুলি তীক্ষ্ণতর।

অনেক সময় অবশ্য মনে হয়, যে, কোথায় বা এই অনুসন্ধানের তীব্রতা! জীবনানন্দের কবিতায় তো কেবল ক্লান্তি-ক্ষয় আর হতাশার রাজত্ব! তাঁর কল্পনায় নগরসভ্যতা যেন এক নির্মম শিকারী, আর পৃথিবী এক নিরুপায় বাণবিদ্ধ অস্তিত্ব। কিন্তু এইটুকুতেই তাঁর কবিতা সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যাবার আবেশও তাঁর লেখায় আছে। তবে সবচাইতে বেশি চোখে পড়ে অনাদি কালস্রোতের মধ্যে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করবার অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি। এই অনুসন্ধানের স্পৃহাতেই কবি বাঁধাধরা জীবনচর্যার বাইরে এসে, আপন পরিপার্শ্ব ও স্বীয় কাল বিষয়ে প্রশ্নাকুল হ'য়ে ওঠেন ; অতীত-ভবিষ্যৎ, বর্তমান পৃথিবী—সব কিছুর সঙ্গে নিজের একটা সম্পর্কসূত্র খুঁজে পাওয়াটা তাঁর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হয়ে ওঠে। সমাজ-সময়-মানুষ-নিসর্গ—এসবের সঙ্গে তাঁর কতটা সংযোগ—এ প্রশ্ন মনে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর খুঁজে বার করার দায়বদ্ধতাও তিনি অনুভব করেন। এই প্রশ্ন, এই উত্তর—এগুলির চলাচলতা কবির মনকে আরো সজাগ, চেতনাকে আরো অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। এ অনুসন্ধানের ফল হিসাবে কবির বোধগুলির মধ্যেও একটা সামগ্রিকতা এসে যায়—ইতিহাসের বোধের সঙ্গে সময়বোধ, তার সঙ্গে সমাজবোধ, এগুলির মাঝখানের যোগসূত্রকে কবির নিজের কাছেই (এবং আমাদের কাছেও) আরো স্পষ্ট করে তোলে। যেহেতু এ অনুসন্ধানের কোনো অবিসংবাদিত উত্তর নেই (কারণ, আজ যাকে ঠিক মনে হয়, কাল দেখি তাই-ই ভুলে ভরা), তাই খোঁজার পালা চলতেই থাকে এবং প্রক্রিয়াটি ক্রমশ তাঁকে ত্রিকালিক ইতিহাসের মধ্যে মগ্ন করে ফেলে। সেকাল-একাল-আগামীকালের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাঁর চেতনা—খুঁজে বার করতে চায় একটা সঙ্গতি, যা তিনি 'কবিতার কথা' গ্রন্থে এই ভাষায় বলেছেন—"যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে—মানবকে ফলিয়ে তুলে—তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়—যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে, সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে—তবুও তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয় ; মহাসময়ের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে শতচ্ছিন্ন অন্তরিন্দ্রিয়কে আবার ছেদ করে এ এক মনোমৈত্রী।"

জীবনানন্দের এই সচেতনা তাঁর কবিদৃষ্টিকে আরো ব্যাপ্ত ও স্বচ্ছ করেছে। এই ব্যাপ্তির পরিধিতে সমাজ-ও প্রবেশ করেছে, কারণ কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার এবং

পাঠককে তা বোঝানো দরকার। এ সমাজ মানুষকে দিয়ে তৈরি। মানুষকে মানুষের নিঃশেষে বোঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা—এইটেই কবির করণীয়, যাতে নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায় অপরকে দীক্ষিত করা যায়—বোধের এই স্বচ্ছতাও এসেছে তাঁর মধ্যে।

অনেকে তাঁর এহেন ইতিহাসসচেতনতার মধ্যে একটি নঞর্থক দিক খুঁজে পান ; বলেন যে জীবনানন্দ "....ইতিহাসচেতনাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন বর্তমান পৃথিবীর আত্মিক শূন্যতায় রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো তাঁরও মনে হয়েছিল "এখানে আনন্দ, প্রেম, আলো কিছু নেই, না আছে ব্যথার নিরাময়তা, না বিক্ষোভে শান্তি, না চিন্তার নৈরাজ্যে বিশ্বাসের ধ্রুবতারা।" অস্যার্থ, যেন কবি আর কোথাও খুঁজে পেলেন না স্বপ্নের জগৎ, অতএব অতীত ইতিহাসই এখন পলাতকের একমাত্র আশ্রয়। হয়তো কিছু কিছু কবিতায় ইতিহাসই পালিয়ে বাঁচার মরূদ্যান। কিন্তু ইতিহাসচৈতন্যের তথা সময়চেতনার সদর্থক দিকও আছে। কবি যখন বলেন—"কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাড় ঝ'রে গেছে, কবে যেন ; এ জনমে নয় যেন—এই পাড়াগাঁর পথে, তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা আমি তার সাথে," তখন তিনি একথাই বলতে চান মৃত্যুর চূড়ান্ত প্রাচীরের গায়ে যদিও আছড়ে পড়ছে অসহায় মানুষের অশান্ত কামনা, কিন্তু সেই পরাক্রমী মৃত্যুকেও পরাজিত করবার সূত্র আছে এই কালচেতনার মধ্যে, যে বহুকাল ধরে জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে হেঁটে গেছি আমি—হেঁটে যাব ভবিষ্যতেও। এই কালসচেতনতার কাছেই মৃত্যু পরাভূত। 'মকর সংক্রান্তির রাতে' কবিতায় বলা হয়েছে—

"দিল্লী কলকাতার নকটার্ণে
অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হ'য়ে যাবে না কি।
সূর্য্য আরো নব সূর্য্যে দীপ্ত হ'য়ে প্রাণ দাও পাখী।"

এই অংশটি পড়লে মনে হয়, অন্ধকার থেকে আলোতে উড়ে আসা পাখির মত কবির ইতিহাসচেতনা রূঢ় রুক্ষ বর্তমান থেকে উড়ে গেছে নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ সময়ের দিকে। অনেকে যে জীবনানন্দকে নির্জন কবি বলেন, তা বোধ হয় এই কারণে, যে, কাল থেকে কালান্তরের সংযোগসূত্র অন্বেষণের মানস-যাত্রাপথে তিনি একা। একা, কিন্তু বিভ্রান্ত নন। অভ্রান্তভাবে তিনি আপন কবিস্বরূপের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে পাঠককে জানিয়েছিলেন যে, সময়চেতনা তাঁর কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মত এবং এই সময়চেতনা মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত। কবিতার অস্থির ভিতরে ইতিহাসচেতনা এবং মর্মের ভিতরে সময়চেতনা থাকবে—এ-ও তিনি বলেছিলেন। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের অগ্রগতির যে ইতিহাস—তার সারাংশ এবং সমসাময়িক কালের তরঙ্গময় ঘটনাবাহুল্যের মূল তাৎপর্য—এ দুইই বিধৃত থাকবে কবিতায়।

'ইতিহাস' শব্দটা শুধুমাত্র রাজারাজড়ার জীবনী বা উত্থানপতনের বিবরণকে বোঝায় না, মানবসমাজ দীর্ঘকাল ধরে যে নিয়মে বিকশিত হয়, তাও ইতিহাস। অতীতকালের মানুষের কর্মকাণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট বর্তমানকালিক জিজ্ঞাসার তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত উত্তর খুঁজে

বার করাও ইতিহাসের কাজ। মানুষের এতকালের কর্ম, কীর্তি বা অবদান এবং তার প্রতিক্রিয়ার কথা ইতিহাস যখন আমাদের জানায়, তখন সে ঐ সব ব্যাপারের স্বরূপগুলিও আমাদের সামনে ধরে দেয়—আর সেইজন্যেই মানবচেতনায় ইতিহাস এত গুরুত্বপূর্ণ। একজন কবির কাছে তো তার গ্রহণযোগ্যতা অনিবার্য ; কারণ তাঁর পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াতে গেলে উপলব্ধি ও মননের মধ্যে, ইতিবৃত্তধারা ও সময়বিস্তার সম্পর্কে সচেতনতা চাই। মানুষের আবহমান কালের ঐহিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতার ক্রম-অনুবর্তনকে কবি যখন উপলব্ধি করতে পারেন, তখন তাঁর ভাবপ্রতিভা আরো বিস্তৃত হয়—তাই ইতিহাসচেতনা কবিমানসের পক্ষে এক আবশ্যিক অবিতর্কিত উপাদান। জীবনানন্দ কবিতা-বিষয়ক নানা প্রবন্ধে এ কথাটি নানাভাবে বলেছেন ; তাঁর কবিতায় তাঁর ঐ স্বকীয়তা—তথা বিশেষ বোধ-ও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন—

"যতদিন আলো আছে আমাদের জাগিবার শেষ অবসর
যতদিন র'য়েছে এ পৃথিবীতে,—উচ্ছৃঙ্খল সৃজনের পানে
আমরা তাকায়ে রব ততদিন ;—যদি কোনো শৃঙ্খলার গানে
আকাশ ভরিতে পারি,—শান্ত করে দিতে পারি পৃথিবীর জ্বর
আমাদের গানে যদি,—হাত ধ'রে আসিয়াছি তাই পরস্পর"

এ কবিতা পড়লে মনে হয়, যেন আমরাই চিরকালীন, অতীতের মানুষের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আছি বর্তমানের মানুষ, পৃথিবীকে রোগমুক্ত করবো ব'লে। আমরা যেন এই মানবসমাবেশের সচেতন অংশীদার হয়ে যাই। ইতিহাসের সঙ্গে সময়ের অঙ্গাঙ্গিতার যে বোধ কবিমনে জাগরুক, তা থেকে তাঁর মনে হয়েছে, মানুষ বা তার জন্ম-মৃত্যু নয়—সময়ই সর্বাধিক শক্তিমান। সময় যেন এক অনন্ত ক্যানভাস, যার বুকে মানুষের ইতিহাস চিরকাল চলে ছবি আঁকতে আঁকতে। শীতের রাতে, স্থির নক্ষত্রের তলায়, মানুষ তার জীবন ফুরিয়ে ফেলে—আর প্রতীক্ষারত প্রেমিকের মত নির্ঘুম অক্লান্ত চোখে জেগে বসে থাকে সময়—

"আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে মুছে ফেলে তুমি যাও চলে
হে সময়,—সিন্ধুরেও তুমি এসে একদিন স্তব্ধ ক'রে যাও ;
ডুবায়ে নিভায়ে যাও সবি তুমি,—তুমি এসে সকল ফুরাও,
তুমি একা জেগে থাক হে সময়, সকলের জাগা শেষ হ'লে!"

সময়চেতনাকে তিনি 'সঙ্গতিসাধক সত্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই 'সঙ্গতিসাধক' বিশেষণটাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই প্রেম-মৃত্যু-নিসর্গপ্রীতি—এসব বোধগুলির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করছে তাঁর সময়চেতনা—আর, এমনকি তিনি এও বলেছেন—"সময়প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার ক'রে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করতে চেষ্টা করেছি।" তাই যখন তিনি নিসর্গপ্রীতির কথা বলেন, তখন একটা ধারাবাহিকতার অনুভব তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—

"অনেক শতাব্দী ঝ'রে চলে গেছে, —তবু সেই পৃথিবীর পুরানো সে পথ
র'য়ে গেছে ;—মাথার উপর' আজো র'য়ে গেছে সেদিনের বিস্তৃত আকাশ।
যদিও অনেক তৃণ ঝরে গেছে,—তবুও মাটির থেকে যে সবুজ ঘাস

ফ'লে ওঠে তার গন্ধে স্থির হয়ে জেগে আছে আজো সেই পুরানো জগৎ।
..তবু যেন মনে হয় যেই শস্য হয়ে গেছে চাষ
তারপর ঝরে গেছে,—ক্ষেতে মাঠে হইতেছে যেন তার আবার বিকাশ!"

যখন তিনি প্রেম-এর কথা বলেন, তখন-ও উপমাচয়নের মধ্যে দেখতে পাই যা স্থির, যা অনশ্বর—সময়ের পর সময় জুড়ে যার অবস্থিতি—তার উপরেই তাঁর ভরসা। অপরিবর্তনীয়ের প্রেক্ষাপটেই পরিবর্তনকে সঠিক বোঝা যায়—

"তুমি কাছে ছিলে ব'লে ;—তাই ম'নে হয়েছিল মানুষের হৃদয়ের সাধ
যে ভালোবেসেছে তার ভালবাসা ল'য়ে শুধু একখানা ঘর
বাঁধিয়া রাখিতে চায় ; নির্ভর করিতে চায় হৃদয়ের প্রেমের উপর!
কারণ, তারার মত স্থির প্রেম,—বালির মতন এই পৃথিবীর বাঁধ
খ'সে পড়ে চারিদিকে....।"

শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যেই রয়েছে সেই ইঙ্গিত—যে প্রেম স্থির এবং অবিনশ্বর—সে বালির বাঁধের মত ক্ষণস্থায়ী নয়। যখন কবি মৃত্যুর কথা বলেন, তখন একবারও বলেন না, যে, মৃত্যুতেই সব শেষ। 'আমার মৃত্যু'—এভাবে বলতে অভ্যস্ত নন তিনি, অধিকাংশ সময়েই বলেন 'আমাদের মৃত্যু' 'আমরা' 'সকলে'—সমস্ত মানুষের সঙ্গে এইভাবে জড়িয়ে থাকেন তিনি—

"পৃথিবী বিদায় লয়ে দূরে—দূরে—আরো দূরে—দূরে চলে যায়,
তাহার পায়ের শব্দ তারপর থেমে যায় নক্ষত্রের তলে ;
তারার আলোর মত দিনের আলোর কাছে লয়েছি বিদায়,
স্থির নক্ষত্রের মত ঘুমায়ে র'য়েছি ধীর নদীটির জলে ;
ঘুমের সান্ত্বনা শান্তি পাবে ব'লে সকলেই ক্লান্ত হ'তে চায়,—"

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে মনে হয় যে, ইতিহাসচেতনার অমোঘ বিবর্তনের অনুভবই যেন জীবনানন্দের মনোভূমি। আবার এই ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে প্রেম-সময়-সমাজ-মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস—সবকিছু। 'কেন লিখি' নামের প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—"শোষিত সমাজজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশাভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেককিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হ'য়েও কেবলি শ্রূয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ...।" উল্লিখিত আশা ভরসার কথা ভেবেই তিনি এভাবে বলেছিলেন, যদিও এযুগে যাত্রিকের সামনে কোথাও কোনো কান্তিময় আলো নেই, তবু মানুষের বিহ্বল আত্মা রাত্রির শব্দহীন অন্ধকারের মধ্যে পরিশুদ্ধ হবে। এ বিশ্বাস আসে প্রকৃতির দিকে তাকালে, যেখানে সুনিশ্চিতভাবে রাত্রির পর দিন আসে, মৃত্যুর পর আসে জন্ম—

"পৃথিবীর সাথে চলে ক্লান্ত হ'য়ে খুঁজি নাক' তবু অবসর ;
কারণ,—দিনের পরে রাত আসে,—লয়ে আসে তার নিশ্চয়তা
জীবনের পরে মৃত্যু ;—যতদিন জেগে' আছি নক্ষত্রের প্রথা

কে করিবে বিচ্ছৃঙ্খল?...."

তাই জন্ম-কর্ম-মৃত্যুর মধ্যে মানবজীবনের যে স্বাভাবিক গতিরেখা ; তার মাঝখানে যখন ধ্বংস অসময়ে প্রবেশ করে, তখন মানুষ বারে বারে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং মরে। মৃত্যুর সম্ভাবনায় চঞ্চল এই জীবনে বারে বারে ফিরে আসে ধীর নদী, ধূসর প্রান্তর, শান্ত গৃহ, উষ্ণ কোমল চোখের এক নারীর স্মৃতি, যে নারীর দেখা আমরা পেয়েছি 'বনলতা সেন' কবিতায়। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ চলার ক্লান্তিকে ক্ষণিকের জন্য দূর করে দেয় বনলতা সেনের সান্নিধ্য, তার আশ্বাসভরা দৃষ্টিতে পাওয়া যায় দুদণ্ডের শান্তি। এই শান্তির জন্য মানুষের মনে এক চিরকালীন তৃষ্ণা আছে। মানবসভ্যতা যে অগ্রগতির পথে চলে, তার পিছনে আছে এই শান্তির অনুসন্ধান। এই অগ্রগতি একদিন কবিকে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয় যে, রণ-রক্ত-সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়। 'সূচেতনা' কবিতায় প্রকাশিত এই সচেতনতা আসলে এক ধরনের ইতিহাস-সচেতনতা, কারণ বহুকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করে তবেই কবি অন্যত্র এই ভরসার কথা বলতে পেরেছেন—

"তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজগুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।" (১৯৪৬-৪৭)

ইতিহাস, সময় এবং সমাজকে জীবনানন্দ গভীরভাবে মর্মস্থ করেছেন—একথা সত্য। তবে ইতিহাসের বহিরঙ্গের উচ্চকিত ঘটনাবলীতে তিনি সর্বদা প্রভাবিত হননি। ঐ সকল ঘটনার অন্তরে প্রবেশ করে, মনীষার আলোতে তিনি খুঁজে ফিরেছেন মানবেতিহাসের ক্রম-উত্তরণের রহস্যকে। তাঁর কবিতায় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বা স্থানগুলির উল্লেখ (যেমন—বেবিলন, বিম্বিসার, শ্রাবস্তী, অশোক ইত্যাদি)—তাঁর ইতিহাসবোধের আংশিক প্রকাশ মাত্র। তিনি যখন তাঁর নিজের সৃষ্টির পরিধিতে ইতিহাস-সমর্থিত চরিত্র ও ঘটনাকে অতিক্রম করে, তার মনের অন্তঃস্তলে লালিত এক উত্তরণপ্রয়াসী সঙ্গতিসাধক বোধ পরিস্ফুট করেন, সেইটেই হয় তাঁর বিশিষ্ট ইতিহাসচেতনা। তখন তিনি পিরামিডের মধ্যে শুধুমাত্র অতীতের স্তব্ধ প্রেত-প্রাণকে দেখেন না, বরং প্রত্যাশা করেন —"মিশর অলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্বলে।" এ প্রত্যাশা শুধুমাত্র পিরামিডের কাছে বা মিশরের কাছে নয়। মানুষের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তিনি দেখেন, সমাজের যে আদর্শ রূপ তাঁর কল্পনায় আছে—সেগুলির বাস্তবায়নের আশা এবং বিশ্বাস তিনি লাভ করেন ঐ ইতিহাস-সচেতনতা থেকে।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সমস্ত কীর্তিগুলি যেন এক একটি মুক্তা ; আর ইতিহাসবোধ সেই সূত্র, যাতে ঐ মুক্তাগুলি গাঁথা হয়েছে। আর, এইভাবেই সবকিছুর মধ্যে সঙ্গতি সাধিত হয়েছে—সার্থকভাবে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ
২. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—দীপ্তি ত্রিপাঠী
৩. জীবনানন্দের চেতনাজগৎ—প্রদ্যুম্ন মিত্র
৪. বিভাব—জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যা
৫. জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৬. এই সময় ও জীবনানন্দ—শঙ্খ ঘোষ সম্পাদিত
৭. কবি জীবনানন্দ দাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য
৮. কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ—সুমিতা চক্রবর্তী

এক ভবঘুরে জাতকের কাহিনী

তাঁর নাম প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। 'মহাস্থবির জাতক' গ্রন্থের মহাস্থবির তিনি। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরে পাঠককুল চমকে গিয়েছিল। তার নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল নামকরণের অভিনবত্ব। স্থির-স্থবির-অস্থির, এই তিনটি ব্যঞ্জনাগর্ভ বিশেষণের, বিশেষ্যরূপে একত্র উচ্চারণ পূর্বোক্ত বিশেষ গ্রন্থটির কথাই মনে করিয়ে দিত। তদুপরি ছিল, মনোগ্রাহী করে কথা বলতে পারায় লেখকের আশ্চর্য দক্ষতা। এই দক্ষতার জন্যই যে-কোনো সাহিত্যিক আড্ডায় বন্ধুরা সকলেই প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গ প্রার্থনা করতেন আনন্দের সঙ্গে। এত বেশি ধরনের মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন যে, তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি ছিল জমজমাট—আর সেই অভিজ্ঞতাকে জীবন্ত ক'রে উপস্থিত করতে পারতেন বন্ধুদের সামনে। তাঁর লেখার মধ্যেও ছিল, সামনে বসে কথা বলবার এই অতি-নিকট ভঙ্গি। ফলে হরফগুলির মধ্যে লেখকের উপস্থিতির উত্তাপ অনুভব করা যেত। অন্তত 'মহাস্থবির জাতক'-এর ক্ষেত্রে এই কথাটাই প্রযোজ্য।

এই বহু-আলোচিত গ্রন্থটি ছাড়াও আরো অনেক লেখা লিখেছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বাজীকর'। এছাড়া 'ঝড়ের পাখী', 'চাষার মেয়ে', 'দুই রাত্রি', 'কল্পনা দেবী', 'প্রবাসী', 'অচলপথের যাত্রী', 'আনারকলি' এই উপন্যাসগুলি এবং আরো চারটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'তখ্‌ত-এ-তাউস' নামের নাটকটি লিখেছিলেন বন্ধু শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জন্যে—'মাটির ঘর' নাম দিয়ে নাট্যরূপে অনুবাদ করেছিলেন গোর্কির 'Lower Depths', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' নাটকটি বিশ্লেষণ ক'রে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এই লেখালিখির কাজ ছাড়াও তিনি আরো হরেকরকমের কাজ করেছেন জীবনে। ক্রীড়াসরঞ্জাম বিক্রয়, আকাশবাণীতে চাকরি, 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা, 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা, চলচ্চিত্র পরিচালনা ও অভিনয়, এক অভিনেত্রীর পাবলিসিটি অফিসার—এমনই বৈচিত্র্যময় ছিল তাঁর কর্মজীবন। তবে সর্বোপরি তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। বাল্যকাল থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় ক'রে রেখেছিলেন মনের মধ্যে। একবার যখন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে না লেখার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, সে তিরস্কার তাঁর মনে লিখতে না পারার ক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমনই অনুঘটকীয় ভূমিকা পালন করেছিল, যার ফলে জন্ম হয়েছিল 'মহাস্থবির জাতক'-এর। পূর্বের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলিই হল এর বিষয়বস্তু।

২

চারটি খণ্ডে বিভক্ত এই বৃহৎ কাহিনীর নায়ক স্থবির শর্মা। যখন তার বয়স পাঁচ, তখন কাহিনীর শুরু। সে যত বড় হচ্ছে—বদলে যাচ্ছে তার পরিপার্শ্ব। এই পারিপার্শ্বিক বদল এবং তার মধ্যে উপস্থিত স্থবির ও তার চারপাশের লোকেরা—এটাই মূলত এক একটি খণ্ডের বিষয়। প্রতিটি খণ্ডেই কিছু নজর-কাড়া চরিত্র আছেন, তবে প্রথম খণ্ডে উপস্থিত

মহাদেব শর্মার জুড়ি মেলা ভার। তিনি স্থির-স্থবির-অস্থিরের পূজ্যপাদ পিতৃদেব, ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ ভক্ত, সন্তানদের মানুষ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং 'মার ছেড়েছো কি ছেলে বিগড়েছে' প্রবাদে আস্থাশীল। কারণে অকারণে তিন ছেলেকে নানাভাবে প্রহার করেছেন—যার ফলে এক একজনের মন এবং জীবনের গঠন এক এক ধরনের হয়ে গেছে। মহাদেববাবু পরোপকারীও বটে—অত্যাচার দেখলে প্রতিবাদ করতেন, রাস্তার পাগলদের ঘরে এনে প্রতিপালন করতেন, একবার বন্ধুপ্রীতির আতিশয্যে মৃত্যুর দোরগোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছিলেন। এদিকে অন্তরে কিছুটা শিল্পবোধও ছিল বোধহয়—তাই যে-কোনো গানকে সুর, লয় ও ছন্দের মধ্যে ফেলে ভক্তিভরে অক্লেশে গেয়ে যেতে পারতেন এবং পুত্র তিনটিকে সেই গানে গলা মেলাতে বাধ্য করতে পারতেন। সেই অপূর্বকণ্ঠ-কনসার্ট এবং প্রতিবেশীদের সহনশক্তি—দুই-ই প্রশংসাযোগ্য। এ হেন কর্মনিষ্ঠাপ্রিয় মহাদেববাবু যখন একদা বাজার করে ফিরছিলেন, তখন এক দুর্ভাগা চিল তাঁর হাতের সের দেড়েক ওজনের শিলং মাছের টুকরোটি ছোঁ মেরে নিয়ে উধাও হয়। মহাদেববাবু তখনই কর্তব্য স্থির ক'রে (প্রথম কর্তব্য হল মাছ উদ্ধার, দ্বিতীয় কর্তব্য, চিলকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া যাতে আর কোনোদিন এ কাজ না করে) চিলের পশ্চাদ্ধাবন করলেন—"চিল একটু উড়েই কোন ছাতে গিয়ে বসে, আর তিনি ইঁট ছুঁড়ে তাকে উড়িয়ে দেন। শ্রাবণ মাসে লোকে বড় জোর শিলাবৃষ্টি আশঙ্কা ক'রে থাকে। বিনা কারণে ছাতে লোষ্ট্রবৃষ্টি হ'তে থাকায় অনেক বাড়িওয়ালা আপত্তি করায় দু-একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধতে বাধতে থেমে গিয়েছে। এইরকম তাড়া খেতে খেতে চিলের পো শেষকালে তিলজলার মাঠে মাছ ফেলে দিয়ে পালিয়ে বাঁচে।"

এ কাহিনী পড়ে, আমাদের শেষপর্যন্ত চিলটার জন্যই দুঃখ হয়। কারণ সে বেচারা মানুষ চেনেনি। অপরদিকে মহাদেববাবু সকালে বাজার করতে গিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ মাছের টুকরোটা হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। তখন তাঁর চুল ঊর্ধ্বমুখী, রঙ রোদে পোড়া তামাটে, দু হাতের কনুই পর্যন্ত শুকনো কাদা, সর্বাঙ্গে ঘাম। তিনি রণক্লান্ত, কিন্তু জয়ী, এবং এরপর তিনি নিজেই মশলা বেটে, মাছটি রেঁধে উদরস্থ ক'রে আপিসে ছুটির দরখাস্ত ক'রে একখানা পোস্টকার্ড লেখেন, কারণ, আপিসে অনুপস্থিত থাকলে আশু ছুটি নেওয়া-টা কর্তব্য।

যেমন উচিত কাজ করতে, ঠিক তেমনি উচিত কথা বলতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না—দায়সারাভাবে কাজ করতেও ভালোবাসতেন না। তাঁর ছেলেদের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের চরিত্র পুস্তকে সন্তানদের সাপ্তাহিক কাজকর্ম বিষয়ে স্বীয় অভিমত তিনি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতেন। একবার স্থবিরের ওড়ন গচ্চায় (লাট্টু ঘোরাবার একটি পরিভাষা—যার অর্থ লেত্তির একটি হ্যাঁচকা টানে লাট্টু উড়িয়ে হাতে নেওয়া) লাট্টু উড়ে ঝি-এর গা-ছুঁয়ে মা-র পায়ে এসে লেগেছিল। ফলে মহাদেববাবু স্থবিরের চরিত্র পুস্তকে লিখে দিয়েছিলেন—"এই ব্যক্তি অত্যন্ত আত্মসুখপরায়ণ দুর্বৃত্ত। ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য নারীহত্যা, এমন কি মাতৃহত্যায়ও পরাঙ্মুখ নহে।'

সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল এ-ই, যে, এভাবে স্থবিরের বিষয়ে সকলকে সতর্ক ক'রে দিয়ে তিনি মানবসমাজের উপকার করেছেন।

৩

সেকালের স্কুলের শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের কথা প্রেমাঙ্কুর কিছু বিশদভাবেই বলেছেন। নানাকারণে, বারকতক তাঁকে স্কুল বদ্‌লাতে হয়েছিল। তাই নানারকম স্কুল এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখেছিলেন—তবে মারণ-বিদ্যায় সব গুরুমশাইরা মোটামুটি দক্ষ ছিলেন, তৎসহ কেউ কেউ কথার মার দিতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁরই দু একটি বক্তব্যে চোখ রাখা যাক—

১. "শিক্ষয়িত্রীদের সত্তায় দশমহাবিদ্যার অংশ ছিল অল্প।"

২. "....তিন বছরের মধ্যে যতদিন যতবার তাঁর চোখের সামনে পড়েছি, ততবারই তিনি আমাকে ব্রাহ্মভাষায় গালাগালি দিয়েছেন।"

তিনি লিখেছেন থিয়েটার ও বাল্যবিবাহ বিদ্বেষী শ্যাম মাস্টারের কথা, সাদা চামড়ার আলেকজাণ্ডার টমরীর কথা, যিনি বাইবেল পড়াতেন এবং নিয়মিত ছাত্র পেটাতেন, অজাতশত্রু দার্শনিক মিস্টার স্টিফেন—স্পষ্টবক্তা—পণ্ডিতমশাই, বিদূষী লাবণ্যপ্রভা বসুর কথা। স্কুলগুলিতে দীর্ঘকাল কাটিয়ে তিনি কিছু বন্ধু এবং কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। বড়ো স্কুলের ছেলেরা কেমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খারাপ কথা বলে, নানা মেজাজের যমদূত চেহারার মাস্টারেরা কেমন ঠেঙিয়ে মেরে ফেললেও 'আহা' বলবার কেউ থাকে না, কেউ কেউ ঠেঙাবার কাজে বেতের চাইতে ম্যাপ পয়েন্টার বেশি পছন্দ করেন, পাড়ায় থিয়েটার করার অপরাধে ছাত্র মাস্টারের কাছে বেধড়ক মার খায়, ছাত্র আর মাস্টার যেন দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের মতো একে অপরের মুখোমুখি হন—এসব তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি স্কুলের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কেও কয়েকটি ন্যায্য কথা বলেছেন—

"যদি কোনো ছেলে নবম শ্রেণীর C বিভাগে ভর্তি হ'ত, তাহলে তার প্রথম শ্রেণীতে আসতে এগারোটি বছর লাগত। এর মধ্যে আমরা শিখতুম কতকগুলো ইংরেজী কথার মানে, তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকজন ইংরেজের বানানো জীবন-কথা, ইংলণ্ডের ইতিহাসের খানিকটা, অর্ধেক মিথ্যে ও অর্ধেক ভুলে ভরা একখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস....জীবনের এই এগারোটি বছর ছাত্রদের কি মাঠেই মারা যায়, তা বোঝবার মতন অবস্থাও এ শিক্ষায় হয় না....।"

স্কুলে কীভাবে ছাত্রপ্রহার চলত, তার আলোচনা অন্য কথাপ্রসঙ্গে করা যাবে।

৪

এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিলেন পাগল সন্ন্যাসী। প্রথম খণ্ডে উপস্থিত চরিত্র গোষ্ঠদিদির শ্বশুরমশায় ইনি—থাকতেন স্থবিরদের পাশের বাড়িতে। পুরানো কলকাতার বাস্তুনির্মাণ নিয়মে ছাদগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকত, এ বাড়ির ছাদ থেকে সহজেই পাশের ছাদ দিয়ে ও বাড়িতে যাওয়া যেত—অন্তত স্থবির আর অস্থিরের পক্ষে ঐটেই ছিল যাতায়াতের সহজ পথ। ওরা যেত পাগলা সন্ন্যাসীর টানে। ঐ নামটি পাড়ার লোকের দেওয়া—যাঁরা এ লোকটির তল পেতেন না, পছন্দও করতেন না—আর এই অপছন্দটা ছিল মোটামুটিভাবে উভয়পক্ষীয়। কাহিনীর শুরুতে এই মানুষটির বয়স ছিল ৭০/৭২—অথচ ছোট ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মিশতে, লাট্টু ঘোরাতে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি নিজে যেমন চলে

যেতেন ছোটোদের স্তরে, তেমনি তাদেরকেও ঊর্ধ্বস্তরে টেনে আনতেন কাব্য আলোচনার সময়ে। তাঁর মুখে শেলী-র Alastor কবিতার অসামান্য আবৃত্তি শুনে, ধ্বনি ও সুরের যাদুতে সেই বালকদুটির চোখের সামনে ভেসে উঠত Alastor-এর কবির যাত্রাপথ যা অন্তহীন। এ কবির যখন মৃত্যু হ'ল (কবিতায়), তখন পাঠক ও শ্রোতা সকলের চোখই জলে ভরে উঠল। কবিতার আলোচনা, ব্যাখ্যা এবং তার মধ্যে রস উপভোগের যে সম্ভাবনা, তা তিনিই প্রথম চিনিয়ে দিয়েছিলেন দুই ভাইকে। তিনি কখনো ভাবেননি যে শেলী এদের পক্ষে দুরধিগম্য, বরং Alastor-এর পাশাপাশি Epipsychidion, Ode [Hymn] to Intellectual Beauty, The Revolt of Islam-এর মতো কবিতার আস্বাদ তাদের দিয়েছিলেন। সেই হেম-মধু-নবীন বন্দনার যুগে তিনি অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের (যাঁর তৎকালীন পরিচয় ছিল দেবেন ঠাকুরের ছোটো ছেলে) কবিতার শাশ্বতগুণ সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। শুধু কাব্যরস নয়, অন্যরসের দীক্ষাও তিনি দিয়েছিলেন এই দুই বালককে। তাঁর জীবনচর্যার মধ্যে, বন্ধুত্ব স্বীকারের মধ্যে বয়সভার কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি—সমাজে প্রচলিত রীতিগুলি তিনি আদৌ গ্রাহ্য করেননি। বারো ও চোদ্দ বছরের ঐ ছেলেদুটির হাতে তিনি সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর পুত্রবধূর দেখাশোনার দায়িত্ব, কারণ বধূটি এই ছেলেদুটিকে বড়ই ভালোবাসত। মনে হয় পাগল সন্ন্যাসী তাঁর সব কাজেরই যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতেন এই ভালোবাসার নিরিখে।

দ্বিতীয় পর্বে আছে এক অসাধারণ নারীচরিত্র, যাঁকে রাজকুমারী, লক্ষ্মীমণি, গুরুমা—যে-কোনো নামেই ডাকা যায়। তিনি অপূর্ব সুন্দরী, অলৌকিক বিভূতিসম্পন্না, প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী, সাধন-ভজনে সমর্পিত প্রাণ, অথচ মাঝে মাঝে দেহধর্ম এত প্রবল হয়ে ওঠে যে কাশীর রাস্তা থেকে কিশোরদের ধরে এনে ওষুধের মতো তাদের ব্যবহার করেন। এ পর্বের এত সংযত বিবরণ দিয়েছেন প্রেমাঙ্কুর, যে, মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাগ্যিস স্বল্পপ্রতিভার কোনো লেখকের হাতে বিষয়টি পড়েনি। আর আছেন ছোট সাহেব—যাঁর দেহটি ব্যাধিগ্রস্ত কিন্তু মনটি আকাশের মতো উদার। এঁর মহীয়সী ভগ্নী দিদিমণি। তাঁর ভাণ্ডারেও আছে এক বিচিত্র জীবনকাহিনী। এই সচ্ছল পরিবারের কর্ত্রীর সঙ্গে স্থবিরের যখন পুনরায় দেখা হয়, তখন তিনি বৃন্দাবনের ভিখারিনী কিন্তু পূর্বের মতোই আভিজাত্যময়ী। প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্থবিরকে জানান যে, গোবিন্দের কৃপায় তাঁর কোনো অভাব নেই।

এছাড়াও নজর কাড়েন সন্তুতুল্য নবাবসাহেব এবং তাঁর নাতি পিয়ারাসাহেব। দুই ভবঘুরে অনাহূত অতিথিকে এঁরা যে যত্নে ও সম্মানে রেখেছিলেন, তাতে মনে হয় 'অতিথি নারায়ণ' এই বাক্যাংশে এঁদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। যদি নবাবসাহেব দীর্ঘদিন বাঁচতেন তাহলে হয়তো স্থবির ও পরিতোষের ভবঘুরে বৃত্তির এখানেই অন্ত হত এবং তাদের মন গৃহকোণে সঞ্চিত প্রীতি ভালোবাসার প্রতিও আকর্ষণ বোধ করত।

তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বেও রাশি রাশি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে। বস্তুত প্রেমাঙ্কুর তো জীবনে কম মানুষের সান্নিধ্যে আসেননি। বরং দেখা যাক শৈশব পর্যায়ের চরিত্র তাঁর হাতে কী রূপ নিয়েছে।

৫

বালকচরিত্র প্রেমাঙ্কুরের কলমে এক নতুন রূপ পেয়েছে। বস্তুত এ কাহিনী যখন শুরু হচ্ছে, তখন স্থবিরের বয়স পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছয়। প্রৌঢ় বয়সে জাতক লেখবার সময়ে সেই পাঁচ বছর বয়সের মনোভাবটিকে ভুলে যাননি লেখক, ন' বছরের দাদা স্থির ছিল স্থবিরের জীবনের আদর্শ—বিদ্যা-বুদ্ধি-শৌর্যে দাদার তুল্য কাউকে সে দেখেনি। বাড়িতে সে সদাই দাদার পার্শ্বচর। বাড়ির ছাদে ফুটবল খেলতে গিয়ে যখন স্থবির ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছিল, তখন এই দাদাই ছুটে এসে পড়ন্ত স্থবিরের পা দুটি চেপে ধরে এবং অস্থিরের সহযোগিতায় তাকে ওপর দিকে টানতে থাকে। দাদা যে অনুমোদিত ব্রহ্মসঙ্গীতের বাইরে অন্য গান গায়—এমন ভয়াবহ তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দাদার প্রতি আনুগত্যের জন্যই স্থবির তা বাবা-মাকে বলে দেয়নি।

স্থবির না-শিশু না-বালক। শিশু হিসেবে অভিভাবকদের সস্নেহ প্রশ্রয় সে কখনো পায়নি। অথচ এর জন্য তার মনে যে অভাববোধ ছিল, তা বোঝা যায়, যখন সে অপ্রত্যাশিতভাবে মায়ের আদর পেয়ে অভিভূত হয়ে যায়। এদিকে 'আমি সব পারি' গোছের বালকসুলভ দম্ভও তার মধ্যে আছে, আছে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠার বাসনা। তাই দাদা যখন বলে, যে, মেছোবাজারে বড় করিমের আখড়ায় বজ্রবাঁটুল তাকে সাগরেদ্ ক'রে দেবে, তখন স্থবিরের মনটা হায় করে ওঠে। বাঁটলোর মতো বন্ধু এবং উক্ত করিমের সাগরেদি লাভ মানে তো পৃথিবী হাতের মুঠোয়! হায়, সে কবে এত বড় হবে যে মেছোবাজারের মাঝখান দিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাবে ; কারণ সে শুনেছে (দাদার মুখে) যে ঐ অঞ্চলে বুক ফুলিয়ে হাঁটলে লোকে বুকে এমন ঘুঁষি মারে, যে, পিঠ দিয়ে হাত বেরিয়ে যায়।

স্থবির খুব কল্পনাপ্রবণও বটে—তাই শীতের ভোরে ময়দানে ঘোড়ার নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয়, যে, ঘোড়াটার পেটে আগুন লেগেছে। গোরা সৈন্যদলের মার্চিং দেখে তার মনে হয়—"যেন একখানা মাঠজোড়া রঙিন ছবি বনবন করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।"

ভোরবেলায় ব্রাহ্মসমাজের বাধ্যতামূলক উপাসনার সময়ে যখন সে ঢুলতে থাকে, তখন মুখ্য আচার্যের বক্তৃতা শুরু হয়। তার মনে হয় এ-ও যেন একটা স্কুল—"বেদীর ওপর মাষ্টারমশাই, আর চারদিকে ছাত্রছাত্রীর দল। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নাডুগোপাল হ'তে হয় না, তাদের গলায় ইঁটের মেডেল দোলে না।"

এমনধারা কল্পনার মূলে স্বভাবতই বাস্তব অভিজ্ঞতার রসসিঞ্চন থাকে। তা ছিলও। শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত ছাত্র হিসেবে জীবনযাপনের যে বর্ণনা স্থবির দিয়েছে, তা পড়লে আমরা বুঝে যাই স্কুল বলতে স্থবির কী বোঝে! এখানে এক ক্ষুদ্র মানবকের দৃষ্টিতে স্কুলের স্বরূপ যেমন ধরা দিচ্ছে, ঠিক তেমনি পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণাসূত্রে এক পরিণত মানুষের চোখে শিক্ষাক্ষেত্র কীভাবে ধরা দিয়েছে—তার কথাও আছে। এ দুটি ভিন্ন বয়সের দেখা—অথচ লেখক যেভাবে এ দুয়ের মধ্যে সাম্যসাধন করেছেন, তাতে এমনকি, জোড় মেলাবার দাগ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

৬

প্রেমাঙ্কুর যে এককালে নাটক লিখেছিলেন, সেটা এই কাহিনীর কিছু কিছু অংশ পড়লে বোঝা যায়। সংলাপের পিঠে সংলাপ বসিয়ে নাট্যরস সৃজনের ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত ছিল এবং মাঝে মাঝেই সে ক্ষমতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। যেমন :

"অস্থির বললে, স্থব্‌রে, তুই ম'রে গিয়েছিলি ভাই, আমি তোর জন্যে কত কাঁদলুম।

মা অস্থিরকে ধমক দিয়ে বললেন, অমন কথা আর কখনও মুখে এনো না।

দাদা বললে, খুব ছেলে তৈরি হয়েছিল স্থব্‌রে! যেখানে যাবে, সেখানেই হাঙ্গামা বাধাবে।

মা বললেন, আর বলো না। আমার হাড় ভাজাভাজা করলে!

বাবা বললেন, এই ছেলেকে নিয়ে তোমায় অনেক ভুগতে হবে।

মা বললেন, আমার বরাত।"

আরো একটি উদ্ধৃতিযোগ্য নমুনা দেওয়া যাক। কবি মধুসূদন দত্তের খ্রিস্টান হওয়া এবং হিন্দু দেবদেবীদের উপরে কবিতা লেখা বিষয়ে মাস্টারমশাই ও ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। তখন—

"মধুসূদন জিজ্ঞাসা করল, ক্রীশ্চান কেন হ'ল স্যার?

প্রিয় মাষ্টার বলতে লাগলেন, মোদো তো ক্রীশ্চান হ'য়ে দেশে গেল! পড়শিদের ডেকে বললে, আমি তোদের জাত ছেড়ে ক্রীশ্চান হয়েছি।

প্রতিবেশীরা বললে, বেশ করেছ বাপ মোদো। জিতা রহো। কথাটা কানাঘুষো হ'তে হ'তে মোদোর মায়ের কানে গিয়ে পৌঁছল।

মা বললে, হ্যাঁ মোদো, এ কি শুনছি রে?

মোদো বললে, কি শুনছ মা?

তুই ক্রীশ্চান হলি কেন রে?

মোদো বললে, মা, আমার ফেৎ (Faith) হয়েছে।

প্রিয় মাষ্টারের কথা শেষ হ'তে না হ'তে আমাদের মধুসূদন তড়াক ক'রে উঠে বললে, আমারও একটু একটু ফেৎ হচ্ছে স্যার।"

অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৭

'টিরেনচ্যাণ্ডাইন' বা 'স্যালিয়াম' এসব শব্দ কি শোনা শোনা লাগছে? তেমনটি হবার কথা নয় অবশ্য, কারণ এ দুটি যথাক্রমে 'টিংচার আইডিন' ও 'শালা'র অপভ্রংশ। অবশ্য অপভ্রংশ নয়, তবুও চেনা শক্ত—এমন ধরনের শব্দও ঢের আছে। যথা—কানৌটি, গ্যাঁড়াব্যাঙ্ক, পতাকী ফাঁড়া, আঁয়-বাঁয়-সাঁয় বাজে কথা, কুকুর-কৌতূহল, ঘেঁচি-ট্যাংরা, ক্লাশের কনস্টেবল, ইত্যাদি। বিশেষণ প্রয়োগেরও অভিনবত্ব আছে, যেমন, পোড়ারমুখো ট্রেন, পাশবিক জলসা ইত্যাদি। বিশিষ্ট ধরনের ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ব্যবহার ক'রে একটা বিশেষ ধরনের অবহ তৈরি করতে পারেন তিনি, যার দু একটি নমুনা পেশ করা

যাক—

১. এমন সময়ে সেই স্ত্রীলোকটি একটা লম্বা লাঠি হাতে ক'রে তীরবেগে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে একমুহূর্তের মধ্যে জনার্দনকে ধড়াক্ ধড়াক্ ক'রে ঘা কয়েক জমিয়ে দিলে।

২. বেশ বোঝা গেল, বাটির উষ্ণতার কিছু অংশ তাঁর মেজাজেও সঞ্চারিত হয়েছে।

৩. ঘুম থেকে উঠে দেখি, পরিতোষবাবুর তখনও নিদ্রাভঙ্গ তো দূরের কথা, তিনি একেবারে বেনের পুঁটুলি মেরে গেছেন, সেই পুঁটুলির গেরো খুলতে আমার দম বেরিয়ে গেল।

Humourous বাক্য এবং বাক্যাংশের যত্রতত্র ব্যবহার পাওয়া যায়, যেমন—

১. স্বামী আমার মাছ খাবার টিকিট।

২. মিনিটে সত্তরটা হিসেবে রামনাম জপ করতে শুরু ক'রে দিলুম।

৩. ....সেই অসম যুদ্ধের নিখুঁত বিবরণ দেবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মিনিট পনরোর মধ্যেই শ্যাম মাষ্টারকে একেবারে রাম মাষ্টারের মত দেখতে লাগল।

৪. পায়ে মারবেন না স্যার। পা ভেঙে গেলে আর ইস্কুলেও আসতে পারব না, আপনার হাতে মার খাবার সৌভাগ্যও আর হবে না।

৫. এতদিন বাদে হাতের জল শুদ্ধ হবে, আর কেউ বলতে পারবে না যে ছেলেটা মেয়েদের ইস্কুলে পড়ে।

৬. প্রবাদ আছে, এক যুগে দুজন মহাপুরুষ থাকেন না। বোধহয় সেইজন্যেই আমি ধরাধামকে ধন্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায় ইহলোক থেকে চলে গিয়েছিলেন।

অলৌকিক ঘটনায় প্রেমাঙ্কুরের আস্থা ছিল এবং এমন ঘটনা তাঁর জীবনে বারে বারে ঘটেছে। এগুলির কথা তিনি বলেওছেন তাঁর জাতকে। তবে এই ধরনের এমন একটি বর্ণনা আছে, যা প্রবল হাসিরও জন্ম দেয়। তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সেটি শুনতে হবে—

"আমার ট্রাঙ্কটার তলায় দু'টো চাকাও লাগানো ছিল। দেখলুম পাথরের মেজে দিয়ে ঘড়াক্-ঘড়াক্ ক'রে স্বয়ং চালিত হ'য়ে সেটা আমার ঘরে এসে ঢুকল।...ওদিকে চ্যাঁ চ্যাঁ ক'রে...গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর সামনে এসে দাঁড়াল।....তাকে বললুম, তোর বাক্সটা ঘরের কোণে রেখে দে। আর আমার ট্রাঙ্কটাও ঠেলে ঘরের একপাশে রেখে দে। কিন্তু তখুনি গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর কাছে আর আমার ট্রাঙ্ক আমার কাছে এসে পড়ল। এইরকম প্রায় রাত্রি বারোটা অবধি ভূতের সঙ্গে খেলা ক'রে সর্বাঙ্গ টাটিয়ে গেল।...শুয়ে পড়বার মতলব করছি—এমন সময় দেখি পায়খানা থেকে কমোডটা সরতে সরতে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। অবশ্য অবস্থাটা কমোডে বসবার মতই হয়েছিল কিন্তু ভরসা ক'রে আর বসতে পারলুম না—কাজেই শুয়ে পড়া গেল।"

এই হাসিই কিন্তু তাঁর মুন্সিয়ানার শেষ কথা নয়। জমাট-বাঁধা অশ্রুর কাঠিন্যও তিনি দেখিয়েছেন। একবার তাঁর বাবা তাঁর দাদাকে প্রায় সারাদিন ধরে অমানুষিক প্রহার করেছিলেন—শেষে প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপে এ পর্ব থামে। সারারাত মা রইলেন আহত ছেলের কাছে। কী সব কথা হল তাঁদের মধ্যে। ছোটো ভাইদুটো সব জানবার তাড়নায়

ছটফট করে। তারপর একদিন বাবা অফিসে চলে যাবার পর দাদা স্নানাহার করে একটা বাক্সে জামাকাপড় নিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে একখানা ভাড়াটে গাড়ি চড়ে গেল।—"তারপর তিন বছরের মধ্যে তিন মাস সে বাড়ি থাকেনি। ওখান (বেলগেছের ভেটারিনারি কলেজ) থেকে পাশ করে সে চ'লে গেল বিদেশে চাকরি নিয়ে। সেখানে, না খেয়ে, একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে সে বিলেত চলে গেল।...ইংল্যাণ্ডে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমেরিকায় গিয়ে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে পড়াশোনা ক'রে মানুষের ডাক্তার হয়ে আজ সমারোহে সে বাস করছে।...আজও সে বাড়ি ফেরেনি।"

যে ঘটনা প্রচুর অব্যয় সহযোগে বিশদ ক'রে বলা যেতে পারত এবং পাঠকের অনুভূতির মূলে নাড়া পড়ত—সেই একই ঘটনা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন লেখক, অথচ পাঠকের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে একইরকম। সেইপ্রকার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

"....শোনা-মাত্রই যাঁর হাত থেকে শিকার ফস্‌কেছিল, তিনি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠেই...ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হ'য়ে বর্শা হাতে ছুটলেন সেই শিকারের উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা-খানেক বাদে, খাওয়ার পর্ব তখন মিটে গিয়েছে, লোকেরা শিকার ক্ষেত্র থেকে মাংসপিণ্ড নিয়ে এসে উপস্থিত করলে। তার মধ্যে শিকারী, শিকার এবং ঘোড়া, তিনেরই মৃতদেহ জড়িয়ে আছে। সন্ধের মধ্যে শিকারীর দেহ সৎকার হ'য়ে গেল। তারপরে আর তার নামও কেউ করলে না।"

বিরোধী বক্তব্য একই অথবা সংলগ্ন বাক্যে উপস্থিত ক'রে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারতেন তিনি। যেমন—

১. আমাদের শিশুচিত্ত যখন স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকত, সেইসময় আমাদের বিজ্ঞচিত্তরা কংগ্রেসে ব'সে পরমার্শ করতেন, কেমন ক'রে শাসকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আরও মধুরতর করা যেতে পারে।

২. কর্তা বললেন—দু বেটা খায় বেশি বটে, কিন্তু রাঁধে যা ভাই—একেবারে অমৃত।

আমাদের....ধারণা ছিল তার উল্‌টো। আমরা খেতুম কম কিন্তু রাঁধতুম অতি বিশ্রী।

৩. পয়সার অভাবে না খেয়ে রাস্তায় পড়েছিলুম, এখন ঠেলায় পড়ে ফার্স্ট ক্লাস ফিটনে চড়ে ধর্মশালায় চললুম।

বিশেষ ধরনের মেয়েলি ভাবভঙ্গি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সংলাপের মধ্য দিয়ে—যার ফলে এই ভবঘুরেদের জীবনে ক্ষণিকের জন্য হ'লেও একটা ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এমনকি কখনো কখনো বক্তব্যের পিছনে মানুষটির মুখও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এমন উদাহরণ প্রচুর আছে—তার দু-একটি হ'ল—

১. যাও না, একটা মাদুর নিয়ে এসে মাসীমাকে বসতে দাও না।

২. আমার হাড় ভাজাভাজা করলে!

৩. তোমাকে এখন ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।

৪. পোড়ারমুখো ট্রেন আসতে আজ বড্ড দেরি হবে মনে হচ্ছে।

৫. আমার যেমন কপাল!

৮

শুধুমাত্র বর্ণনার সাহায্যেই কোনো বিশেষ অঞ্চলের সম্পূর্ণ আবহ তৈরি করতে পারতেন তিনি। পুরোনো কলকাতার কথা, সেকালের স্কুলের কথা, অধুনা মুম্বই এবং পূর্বের বোম্বাইয়ের ভিখারিপট্টির কথা, কাশী ও তার বিখ্যাত গলিগুলির কথা—এগুলি তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন। প্রথমে তাকানো যাক পুরোনো কলকাতার দিকে। তখন এ শহর কতকগুলো টোলা বা পাড়ায় বিভক্ত ছিল, যেমন, দর্জিপাড়া, কাঁসারীপাড়া, শুঁড়িপাড়া, মুচিপাড়া, বেনেটোলা, নেবুতলা, আহিরীটোলা ইত্যাদি। পাড়ার মধ্যে বিরাজ করত একটা 'বাধ্যতামূলক' সম্প্রীতি। পাড়াগৌরব বজায় রাখা ছিল একটা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, তার জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে কেউ পিছপা হত না। পাড়াপিছু একটা ক'রে কুস্তি ও জিমন্যাস্টিকের আখড়া ও থিয়েটার ক্লাব থাকত—কদাচিৎ একটা ক'রে শখের যাত্রাদলও দেখা যেত। কোনো কোনো পাড়ার কোনো বিশেষ বিষয়ে নামডাক ছিল—যথা "শুনতুম, আহিরীটোলায় নাকি এমন পাঁচ-সাতজন আছে, যারা বেমালুম ছুরি মারতে পারে।...ছুরি যখন মারা হবে তখন কিছুই জানতে পারা যাবে না। মারামারির পর বাড়ি ফিরে গিয়ে টের পাওয়া যাবে। অনেকটা স্নান করতে গিয়ে হাঙরে পা কেটে নেওয়ার মতন।" এই যে বিশেষ ধরনের পুরোনো কলকাতা, তার চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়েছে অস্থিরের মুখের ঘুড়ি ওড়াবার বুলিতে—

"দু-বেলা লাল বুলুক-কো-ও-ও-ও, সুতো ছাড়ে না জুতো খায়, এক-কো-ও-ও-ও, স্থব্‌রে, নীচে পড়্, নীচে পড়্, মার টান্-মার টান্-ভো-কাট্‌কা-হো-হো-হো..."—এখন আর ঠিক এই বাক্য শোনা যায় না, এখন তাতে সময়োচিত পরিবর্তন এসে গেছে।

মুম্বইয়ের ভিখিরিদের বাসস্থান একটু বিশেষ ধরনের—সেখানে এক-একটা ঘরে দুটো-তিনটে ইটের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে রান্না হয়, সেখানে চাটাই হচ্ছে শয্যা এবং ইট হচ্ছে বালিশ, সেখানে দিব্যি দুধ-পাঁউরুটি-চা পাওয়া যায়, এমনকি একজন ডাক্তারও কাছাকাছি আছেন যিনি বিনে পয়সায় রোগীদের দেখে যান, বা প্রয়োজনে হাসপাতালের বন্দোবস্ত করেন। উচ্চবিত্ত মানুষদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এদের জীবনযাত্রাও চলে। এদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আছে—কেউ ঘরে শোয়—কেউবা ফুটপাথে। ফুটপাথে শোবার জায়গাও নির্দিষ্ট—একে অপরের জায়গা অধিগ্রহণ করলে সর্দার সে সমস্যার সমাধান করে।

কাশী শহরের বর্ণনা ও গ্রন্থের একটি আকর্ষণ তো বটেই, তৎসহ আছে কাশীবাসিনী বাঙালি বিধবাদের কথা। কত বিচিত্র রকমের চরিত্র সেখানে—তার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গেলে আর একটি বই হয়ে যায়। তবে যে ব্যাপারটি লেখকের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ লেগেছে, তা হল একদিন সূর্য যাঁদের দেখতে পেতেন না, আজ সেই বিধবারা সকলের চোখের সামনে জলের মাঝে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করছেন, আর সূর্যের রক্তিম আভা তাঁদের শূন্য শ্বেত সিঁথিকে স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে। জীবনে কি অদ্ভুত বিপরীত ব্যাপারের সম্মুখীন হ'তে হয় মানুষকে!

৯

এই সুবিশাল গ্রন্থ রচনার পিছনে কি শরৎচন্দ্রের তিরস্কারই একমাত্র কারণ ছিল? মনে হয় না। লেখক নিজে একস্থানে এবিষয়ে বলেছেন—

"আমার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক মন ও বুদ্ধির অগোচর যে আরও একটা রহস্যলোক আছে, সেখানকার কত বার্তাই আমার কাছে এসে পৌঁছল, কিন্তু সে লোকে প্রবেশ করবার হদিস আজও পেলুম না। জীবনের এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যই এই জাতকের অবতারণা, এই অভিজ্ঞতার জন্যেই আমি মহাস্থবির।"

এই জাতকের প্রথম পর্বের কিছু অংশ বাদ দিলে বাকি সবটাই প্রধানত ভবঘুরে জীবনের কথা। আদিম যুগের যাযাবর মানুষ প্রয়োজন আর বিপদের তাড়নায় বাসা বেঁধে থাকতে শিখলেও, প্রবৃত্তির ভিতরে সুপ্ত হয়ে ছিল যাযাবরবৃত্তির বীজ। এই কাহিনীর নায়কের চিত্তে হঠাৎ অঙ্কুরোদ্গম ঘটল সেই বীজের—আর ঘরে থাকা গেল না। একটা প্রয়োজনীয় অজুহাত তৈরি ক'রে নিয়েছিল সে, সে বাইরে গিয়ে চাকরি-বাকরি তথা উন্নতি ক'রে মায়ের সব কষ্ট দূর করবে—তবে ওটা যে কথার কথা, তা বুঝতে দেরি হয় না পাঠকের। যেরকম পরিবেশ-পরিস্থিতি সকলের ভালো লাগে—সেইরকম আশ্রয়ও পেয়েছিল এই ভবঘুরে নায়ক—যেমন পণ্ডিতজী দেবী-শঙ্করদের বাড়ি অথবা নবাবসাহেবের গরীবখানা—কিন্তু কপালে সইল না। তার জন্য বিশেষ দুঃখবোধও নেই—বরং যখনই তারা বিরোধী এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েছে—সে অবস্থাটাই যেন বেশি উপভোগ করেছে। ছোটোবেলায় বাবার অতিশাসনে গণ্ডির মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছিল। তাই যেখানেই প্রথার গণ্ডি ভাঙতে পেরেছে—সেখানেই স্থবিরের আমোদ। কখনো কখনো রূঢ় বাস্তবের খাতিরে সে বলে বটে যে—"ঠিক হ'ল কাল থেকে যত কম সম্ভব অর্থাৎ প্রাণ ধারণের জন্য যেটুকু না খেলেই নয়, ততটুকু খাওয়া হবে।"—কিন্তু সেই দুশ্চিন্তা তাকে ততটা ত্রস্ত করতে পেরেছে বলে পাঠকের মনে হয় না। উদ্বেগের শিকড়টা যেন তাদের কারোর মর্মে প্রবেশ করেনি। সেইজন্যই দুরবস্থা মোচনের জন্য কোনো কার্যকর চেষ্টা না ক'রে স্থবিরের মন ব্যস্ত থাকে ভিখিরিদের সর্দারকে আপাদমস্তক দেখে নিতে—কেমন তার তেল চক্‌চকে আঁচড়ানো চুল-লম্বা দাড়ি, কেমন তার পরিষ্কার লুঙ্গি আর রঙিন জামা, কেমন ঘোর কালো রঙ আর দুচোখ অন্ধ, পেছনে একখানা লম্বা লাঠি যার কিছুটা এদিক এবং কিছুটা ওদিক থেকে দেখা যাচ্ছে—এবং যার সবচেয়ে গর্বের পরিচয় হল সে কলকাতার হগ্ সাহেবের বাজারের কুষ্ঠী ভিখিরি ঝিলমিল সর্দারের ভাতিজা।

স্থবির ও তার বন্ধুরা পথে নেমে প্রথাগত সব ধ্যানধারণা কবেই ত্যাগ করেছে—তাই দিব্যি সব ধরনের লোকের সঙ্গে তারা মিশতে পারে। এই সহজ ভঙ্গিটিই সর্বাধিক আকর্ষণীয়। ছোটোবেলায় সব শিক্ষা প্রহারের মধ্য দিয়ে পেতে পেতে তারা জীবনকে একভাবে চিনেছিল আর এখন পথে নেমে সুখদুঃখের দোলায় দুলতে দুলতে জীবনের মূল স্বরূপটাকে খানিক খানিক অনুভব করতে পারছিল। বাড়ি ফিরে যাওয়া, চাকরি করা—এগুলি নিতান্তই গতানুগতিক বিষয়—অন্তত তাদের জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতাবলীর কাছে। দিনে ছ'পয়সা মজুরিতে কাজ করা, মাটি মেশানো নুন দিয়ে কালো কাঠের মতো শক্ত বাজরার রুটি খেয়ে

শুকনো পাতার বিছানায় শুয়ে পড়া, সদানন্দ বিশ্বাসের বাড়িতে চাকরের কাজ করা আবার সেখান থেকেই ক্রমশ ভারতীয় নৃপতির রাজ্যে চাকরি করা, যেখানে উড়ে যাওয়া ম্যাক্‌অ পাখির শোকে রাজকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করেন। চূড়ান্ত দারিদ্র্য এবং বিত্ত—এ দুইপ্রকার বিপরীত সান্নিধ্যকে প্রেমাঙ্কুর তাঁর জীবনে একই রকমভাবে গ্রহণ করেছেন—সবকিছুতেই রয়ে গেছে একটা 'কুছ পরোয়া নেই' ভাব। জীবনের পথে কড়ি গুণে গুণে পা মেপে মেপে চলা নয়—যা করতে ইচ্ছা করা তাই করা—কখনো গাঁজা খেয়ে শীত তাড়ানো, কখনো রাজাদের সঙ্গে ওঠা বসা, কখনো ভিখিরিদের সঙ্গে প্রবল দহরম মহরম, কখনো বা হোটেলের জন্য খরিদ্দার ধরা—এসবের মধ্য দিয়ে দেখতে পাই সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার দুই বিপরীত মেরুতে বারে বারে পা দিয়েছেন তিনি—অভিজ্ঞতার জগৎটাকে গড়ে তুলেছেন 'ভালোমন্দ মিশায়ে সকলি'। নীতিকথা এ জাতকে আদৌ নেই, বরং পাঠকদম্পতি ভাবতেই পারেন যে তাঁদের সন্তানটি যেন স্থবিরের মতো না হয়। এ জাতক যেন প্রান্তরের গান—এখানে কোনো কৃত্রিম ঘরবাড়ি বসানো হয়নি। জীবন কত মহৎকে পদাঘাত করে, কত শয়তানকে আলিঙ্গন দেয়—কতজনকে করে বিষজর্জর—কতজনকে দেয় অমৃতের মধুর আস্বাদ! জীবন আসলে মানুষের হ'য়ে ওঠার কাহিনী। মানুষ যত পথ চলে, তত দেখে পুরোনো আপ্তবাক্যের দরকার নেই, 'যখন যেমন তখন তেমন' নীতিটায় আস্থা থাকলেই হল। রবি ঠাকুর 'ক্ষণিকা'য় যেমন লিখেছিলেন—'মনেরে আজ কহ যে / মন্দ ভালো যাহাই ঘটুক সত্যেরে লও সহজে'—এটা প্রেমাঙ্কুর তাঁর নিজের জীবনে ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর জীবনযাপনটা তাই কখনো দীপ্তিহীন-গতিহীন-বিমর্ষতার ম্লানিমায় বিস্বাদ নয়—জীবনের অম্ল-তিক্ত-কটু-মধুর সকল স্বাদই তাঁর উপভোগ্য। মনের অপরিসীম গ্রহণ- ক্ষমতা দিয়ে, অসামান্য রসবোধ দিয়ে এই কাজটাই সহজে ক'রে ফেলেছিলেন তিনি। তাই, তিনি যখন রোগজর্জর, জরাকাতর—তখনো তাঁর মন চিরহরিৎ। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা তো তাঁর সত্তায় মিশে গেছে—তাই বারে বারে নানা পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর জীবনে। এমনই তাঁর গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান যে, যে-ই একটু স্থিতুভাব আসে, অমনি পাগলা মন মাথা নাড়তে থাকে—ঘরের দেওয়াল ভেঙেচুরে পথে নামার পালা আসে। এই পথের মধ্যেই তিনি জীবনকে দেখেছেন।—"মানুষকে দেখেছি, কিন্তু তাকে সাজাইনি...কোনো ছেঁদো কথার জাল ফেলে উড়ন্ত পাখির ডানা বাঁধতে চাইনি। সম্মুখ দিয়ে ব'য়ে গেছে জগৎ সংসার। তার তীরে বসে তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে কেঁদেছি, কিন্তু সে তৃষ্ণা মেটাবার পানীয় বাইরে থেকে কোনোদিনই যে পাওয়া যায় না, সে কথাও মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।...খোলা চোখে মানুষ দেখার ইতিহাস এই জাতকে আমি বার বার জন্মেছি—বার বার মরেছি। আমার সেই অসংখ্য জন্ম-মরণের কথাই পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে আজ বিদায় নিলুম।"

বিখ্যাত ইংরাজী প্রবাদ "A rolling stone gathers no moss. সেই কথাটাই তাঁর জীবনে সত্যি। তাই গোটা জীবনে তিনি কখনো থেমে থাকলেন না, শত রকম কাজ করলেন, আর এইসব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে পৌঁছালেন জীবনের শেষ পর্বে—নদী যেমন তার সব সঞ্চয় নিয়ে এসে পড়ে সাগরে। তারপর জলে জল মিশে যায়। তবু নদীটা থাকে। মহাস্থবিরও চলে যান। থেকে যায় তাঁর কীর্তি।

অচিন্ত্যকুমার : ছোটগল্পের অপরিক্লান্ত শিল্পী

তিনি সারাদিন আদালতে বসে সাক্ষীর জবানবন্দি লেখেন, হয়তো উকিলের বক্তৃতার নোট নেন। তিনি বাড়ি বয়ে আনেন নথি আর নজিরের স্তূপ। সকাল-সন্ধ্যায় তিনি বসে যান সূক্ষ্ম তর্কজালের গ্রন্থি খুলে খুলে নোট লিখতে। এত লিখেও ক্লান্তি নেই ; অক্লান্ত অধ্যবসায়ে লিখতে থাকেন গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ। কতরকমভাবেই না তিনি এসে দাঁড়াতে চান রসস্বরূপের সামনে! তিনিই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

তাঁর সাহিত্যসাধনার ইতিহাস একটি বিস্তৃত যুগের ইতিহাস। সাধনার ঐ বিস্তৃতি তাঁর ছোটগল্পের পশ্চাৎপট নির্মাণে সহায়তা করেছে। তিনি যে যুগের মানুষ, সেই যুগও আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর অনেকগুলি গল্পে।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিশিরচন্দ্র বসু, বিনয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার—এই চার সাহিত্যিক বন্ধু মিলে 'আভ্যুদয়িক' নামে একটা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সঙ্ঘে স্বরচিত গল্প-কবিতা পড়া হত এবং একটা মাসিক পত্রিকা ছাপাবার পরিকল্পনা করা হত। ঐ সময়েই অচিন্ত্যকুমারের পরিচয় হয় 'কল্লোল' পত্রিকার সহসম্পাদক গোকুল নাগের সঙ্গে। সেই পরিচয়সূত্রে তাঁর 'গুমোট' গল্পটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'কল্লোল'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর আগেই 'বাদল বাতাস', 'আলতার দাগ' ও 'কারসাজি' নামের তিনটি গল্প 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ; 'নায়ক-নায়িকা' গল্পটি আত্মপ্রকাশ করেছে 'প্রবাসী'র পাতায় ; নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে তিনি 'প্রাচী' পত্রিকার পাতায় 'নর্দ্দমা' নামের একটি গল্পের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু হাতের কাছেই 'কল্লোল'-এর মত একটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক পত্রিকা এবং জমকালো সাহিত্যিক আড্ডা লাভ করার ফলে তাঁর সাহিত্যপ্রেরণা পেয়ে গেল এক অবাধ গতি—'ভুখা', 'সাহেবের মা', 'ন যযৌ ন তস্থৌ', 'বাঁশবাজি', 'মাটি', 'সারেঙ্'—এগুলি সেই গতিপথের এক-একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে "বুদ্ধ-অচিন্ত্য বেষ্টনী"—এই শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, এবং উভয় লেখকের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যকেও মোটামুটি একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আসলে, রচনার অজস্রতা, লিখনভঙ্গির অভিনবত্ব, সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই অনায়াস বিচরণক্ষমতা—এগুলি ওঁদের মধ্যকার মিল ; কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচন, রচনাভঙ্গি, এমনকি গল্পের নামকরণ-প্রবণতাতেও উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর গল্পনামগুলি সাধারণত এই ধরনের—'ঘরেতে ভ্রমর এলো', 'একটি জীবন', 'ভাসো আমার ভেলা' ইত্যাদি। অচিন্ত্যকুমারের কিছু কিছু গল্পের নাম যদিও 'সন্ধ্যারাগ', 'অচিরদ্যুতি' বা 'তিমিররাত্রি'—কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যবহৃত নামগুলি মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি—যেমন, 'হাড়িহাজরা', 'মাটি', 'জমি', 'গঙ্গাযাত্রা', 'ছুরি', 'কড়ানাড়া', 'সাক্ষী' ইত্যাদি। গল্পগুলিতে রূপায়িত চরিত্রগুলির রূপায়ণেও তিনি অধিকতর বৈচিত্র্যসন্ধানী, সরকারী চাকরি জীবনের নির্দেশে বাংলার শহর আর মফস্বলে ঘুরতে ঘুরতে বিচিত্র পরিবেশে বহু বিচিত্র নরনারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। মফস্বলের উচ্চ ও

মধ্যোচ্চ দরের শাসক—এদের অন্তঃসারহীন আত্মাভিমান, উন্নাসিকতা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতায় এসেছে উকিল-মোক্তার-মুহুরী এবং মতলবসন্ধানী মানুষদের বিড়ম্বিত জীবনযাত্রা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা সহযোগে এদের জীবনকে তিনি সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। তবে এ বাক্যের দ্বারা তাঁর গল্পগুলির বিপুল বিষয়সম্ভারের সম্যক্ প্রকাশ হল না। বরং একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

অচিন্ত্যকুমারের গল্পগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাগ প্রধানত সময়ভিত্তিক। তাঁর প্রথমদিকের লেখাগুলিতে ছিল কবিত্বময় ভাবুকতা, তা সে গল্পের বিষয়বস্তু যতই আটপৌরে হোক না কেন। 'ভুখা' গল্পটিতে বর্ষণমুখর রাত্রে সদ্যমৃত শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে বসে-থাকা এক মায়ের ছবি আছে, যে বারে বারে তার মৃত খোকার গায়ে কাঁথা টেনে দিচ্ছে, পাছে তার ঠাণ্ডা লাগে, পাছে সে বাজের শব্দে ভয় পায়। আর খোকার বাবার স্বগতচিন্তায় শোকের হাহাকারের পরিবর্তে আছে শোকের কলরোল, যেন শিশুটির মৃত্যুর কারণেই ঘরের সঙ্কীর্ণ পরিধি ছাড়িয়ে বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পেরেছে তারা—

"ভারী চমৎকার আছি, না? চারিদিকের বেড়াগুলি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, চাল উড়ে গেছে ঝড়ের ধাক্কায়, বৃষ্টির পশলা তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছে আঙিনায়। তুমি কাঁদছ কেন?....আমাদের আর কোনো গৃহের বন্ধন নেই, ঝঞ্ঝাক্ষিপ্ত রুদ্র উন্মুক্ত আকাশের নীচে আজ আমরা বসেছি।"

লক্ষণীয় 'আলতার দাগ' নামের অণুগল্প বা কথিকাটি ; এটি আমাদের 'লিপিকা'র আঙ্গিক স্মরণ করায়। এর বিষয়বস্তু অতি সামান্য, কিন্তু আছে কল্পনার দৃপ্ত পক্ষবিধূনন। এক তরুণী মুচিকে জুতো সারাতে দেবার জন্য পা থেকে জুতোটি যেই খুলে ফেলল, দেখা গেল পায়ে আলতার দাগ। জানলায় বসে থাকা মানুষটির মনে হ'ল—

"মেয়েটির পদ্মকলির মত ছোট ছোট দুটি পা ঘিরে আলতার লালিম লেপন—একটা যেন রঙীন মায়া, জাগরণের বিচিত্র কোলাহলের মাঝে স্বপ্নের মধুর একটি রেশ, আষাঢ় সন্ধ্যার সুর-ভরা একটি রামধনু।"

এই পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করলে যেন একটা অনতিব্যক্ত আভাসের অস্পষ্ট কিন্তু আশ্চর্য সম্মোহন আমাদের আবিষ্ট করে। এ যেন একটি ক্ষুদ্রায়তন রসনিটোল কবিতা। আসলে কাব্যের আবেগ গদ্যের ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করায় অচিন্ত্যকুমারের সহজ অধিকার। অন্তত, তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে ভাষাগত কাব্যময়তার আধিক্য পর্যবেক্ষণ ক'রে (যে কাব্যময়তা দেখা যায় 'আলতার দাগ', 'সন্ধ্যারাগ', 'গুমোট' প্রভৃতে গল্পে) মনে হয়, যে, এগুলি যেন লেখকের স্বগতচিন্তা, যেন নিজের মনের মত ক'রে তৈরি করা একটা জগৎ। আসলে, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন প্রচুর পরিমাণে, এবং ঐ সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রকাশ দেখে উদ্বুদ্ধ হতেন। অথচ, আমাদের দেশের সমাজে এই ব্যক্তিত্ব দারিদ্র্য-অনটন, ব্যাধি, সামাজিক চাপ—ইত্যাদি বহু কিছুর দ্বারাই প্রতিহত। এমনকি, এইসব প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে প্রকাশকামী ব্যক্তিত্বের যে দ্বন্দ্ব, তাকে

উপস্থাপিত করবার যোগ্য ভাষা পর্যন্ত অনুপস্থিত। সেই কারণে ভাষাকে, সমাজকে, মানুষকে নিজের মত ক'রে গড়ে নিতে হয়েছে তাঁদের। ভাষার ওপরে তাই নবতর আবেগের শীলমোহর পড়ে গেছে অচিন্ত্যকুমারের রচনায়। যেমন—

"মেয়েটি একটি লাবণ্যের নদী। খুব স্রোত নেই, যেন বিকেলের আলোয় টলমল করছে।" (ইতি)

এখানে চোখের দৃশ্য যেন পাঠকের সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গৃহীত হচ্ছে। এ বিষয়ে 'রুদ্রের আবির্ভাব' গল্পটি যোগ্যতম উদাহরণ। একটি পাড়ভাঙা দুর্বার নদী ক্রমশ এগিয়ে আসছে এক দম্পতির সুখের বাসস্থানকে গ্রাস করতে। তার কলহাস্যমুখরা মূর্তি ক্রমশ নিয়তবেগবান এক তীব্র শক্তিতে পর্যবসিত হচ্ছে। সে দৃশ্য যেমন ভীতিকর, তেমনই মোহময়। একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে কী ঘটবে, তা জানবার এবং দেখবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নায়কের মনে, কারণ—

"যা কিছু অসহ্য, তাইতেই তো তীব্র আনন্দ আছে।" সেই আকাঙ্ক্ষিত তীব্র আনন্দের মুহূর্তটি এল নিক্ষিপ্ত তীরের মত তীব্রগতিতে—

"জল, জল, ক্ষুরের মত ধারালো, বিদ্যুতের মত দ্রুত—ধাবমান ঘোড়ার মত ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নেই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁসিয়া-গর্জ্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড় স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়তবেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবনধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র খলহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।"

জীবনের সঙ্গে এই কাব্যভাষা যে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত, তা বোঝা যায়, যখন নায়ক বলে—

"তীরের বন্ধন হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।" এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আর 'হৃদয় দিয়া হৃদি অনুভব'-এর সুযোগ নেই। এখন নায়কের চাকরি খোঁজার পালা, ঠিকে-ঝির সঙ্গে নায়িকার খেলো ভাষায় ঝগড়া করবার সময়, প্রচণ্ড শূন্যতার মধ্যকার মুক্তিতে জীর্ণ হ'বার কাল। নদীর হাত থেকে মুক্তি আছে, কালের হাত থেকে নিস্তার নেই।

অচিন্ত্যকুমারের এই প্রথম যুগের গল্পগুলি প্রসঙ্গে কল্লোলের আবহ-বিষয়ে দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার, কারণ উক্ত সাহিত্যপত্রিকার ভাব-ভাবনা ও সৃষ্টিনিরীক্ষার প্রভাব পড়েছিল তাঁর এই সময়কার গল্পে। আগেই বলেছি, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ওয়েলস্ মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে এক উদার নতুন পৃথিবী কামনা করেছিলেন—এবং একই কামনা ছিল কল্লোলগোষ্ঠীর অনেকেরই। তাঁরা গতানুগতিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না মোটেই। বাংলা সাহিত্যজগতে তখনও রবীন্দ্রনাথের দেদীপ্যমান উপস্থিতি। রবীন্দ্রানুসরণ মানেই আত্মবিলুপ্তি—কল্লোল গোষ্ঠীর অনেক লেখক এইভাবেই ভাবতেন এবং স্বয়ং অচিন্ত্যকুমার একটি কবিতায় লিখেছিলেন যে নতুন যুগের সাহিত্যিকদের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পথরোধকারী

অস্তিত্ব। তাই বিষয় নির্বাচনের সময়ে এঁরা সেগুলিকেই গ্রহণ করলেন, যেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে গ্রহণ করেননি অথবা উল্লেখমাত্র করেছেন।

আরো একটি কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেন গোটা জগৎকে সর্ব অর্থেই সংবেদনশীল বাঙালির অনেক কাছে এনে দিল। বাঙালির চেতনার দ্বারে উপস্থিত হ'ল অনেকগুলি নূতন অভিঘাত—ফ্রয়েডের তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় সেগুলির মধ্যে একটি। এর আগেও মনস্তত্ত্বকে ঘিরে গড়ে ওঠা উপন্যাস আমরা পেয়েছি, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে কার্যকারণ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যাগুলি আমাদের এতাবৎকালীন স্থির প্রত্যয়ে তেমন আঘাত করেনি। কিন্তু সেই প্রত্যয় আর স্থির রইল না ; বা, বলা যায়, আমরাই নতুন মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে উৎসুক হ'লাম, যখন ফ্রয়েড বিশ্ববাসীকে জানালেন, যে, মানুষের সচেতন মনের অন্তরালে একাধিক স্তর আছে, এবং আমরা অনেকসময়ই আমাদের চারপাশের ব্যবহারিক জগতের প্রচলিত নিয়মভঙ্গ করে অবচেতন বা অচেতন মনের নিয়ন্ত্রণে চলে যাই। তখন সমাজ-সংস্কার আমাদের গায়ে অস্বাভাবিকত্বের তকমা সেঁটে দেয়। অথচ ঐ সব তথাকথিত 'অস্বাভাবিক' আচরণের পিছনেও এক ধরনের কার্যকারণসূত্র বজায় থাকে। ধরা যাক, অচিন্ত্যকুমারের 'অমর কবিতা' গল্পটির কথা। নির্মলার একমাত্র শিশুকন্যা বুড়ি একবছর বয়সে মারা যাওয়াতে, শোকাভিভূতা মা তার সাহিত্যপ্রতিভাহীন লেখনী চালনা করে এক সুদীর্ঘ শোককবিতা রচনা করল। সে কবিতায় শোক আছে, আবেগ আছে, অকালমৃতা বুড়ি-র আকর্ষণীয় কীর্তিকলাপের বর্ণনা আছে। নির্মলার ইচ্ছা, সে শিল্পের মাধ'মে তার স্নেহের কন্যার স্মৃতিকে বিস্মরণের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভবিতব্য থেকে বাঁচাবে। ফলে, যখন কেউ-ই তার কবিতার মূল্য বুঝল না, তখন সে তার খুকির ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে—এবং শেষপর্যন্ত একটা বড় পুতুলকে খুকি বানিয়ে, তাকে স্নান করিয়ে, জামা পরিয়ে নিজেকে বিশ্বাস করাতে লাগল যে তার খুকি বেঁচে আছে। তার সংসার অবশ্য তার এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করল না, খুকির বাবা-ঠাকুমা তাকে নিয়মিত কটুকথা শোনাতে লাগলেন। এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে, নির্মলা পাগল হয়ে গেল—ছিঁড়ে ফেলল খুকির ছবি—পুড়িয়ে ফেলল তার কবিতা—টুকরো ক'রে ফেলল পুতুলটাকে। যদি ফ্রয়েডের 'অবচেতনবাদ' তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্মলার জীবনরহস্য বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, সন্তানের দেখাশোনা করা-র বিষয়ে কোনো একটা অপরাধবোধ তার অবচেতন মনে ছিল। তাই শিল্পের মাধ্যমে ঐ অবস্থার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়ে সে আসলে নিজেরই মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু সার্বিক প্রতিকূলতা তার উদ্দেশ্যকে সফল হতে দেয়নি। তাই সে পাগল হয়ে গেছে। খুকির মূর্তি গড়ার যে সচেতন বাসনা—তা আসলে সন্তান-বাৎসল্যের মোড়কে নির্মলার আত্মরতিরই নামান্তর। যে মাতৃত্ব চিরকাল শিল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে, মনঃসমীক্ষণের আলোকে উদ্ভাসিত তার এই নবরূপ আধুনিক জীবনবোধের ট্রাজেডিচেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গেছে। নিজের অবচেতন মনের বাসনার কাছে মানুষের সজ্ঞান চেতনা যে কতখানি অকিঞ্চিৎকর ও অসহায়, সেই উপলব্ধিতেই নির্মলার বেদনা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

অচিন্ত্যকুমারের দ্বিতীয় পর্বের ছোটগল্পগুলিতে দেখা যায়, যে, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

কারণে গল্পগুলি বাস্তবতার ভিত্তিতে দৃঢ়মূল হয়ে পাঠকের আরো কাছে পৌঁছে গেছে। পূর্বোক্ত মাতৃস্নেহের রূপবদল ঘটেছে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' গল্পে। মাতৃত্ব বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণা (অর্থাৎ—'কুপুত্র যদ্যপি হয় / কুমাতা কখনো নয়') এখানে বিপর্যস্ত। দরিদ্র সংসারের বি. এ. পাশ বেকার ছেলে শচীন অকস্মাৎ টেলিগ্রামযোগে খবর পেল, যে, সে দিনাজপুরের ডিস্ট্রিক্টবোর্ডে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানীর চাকরিটা পেয়েছে। সংসারে আনন্দের কলরোল উঠল। এ চাকরিতে সঙ্গে সঙ্গেই যোগদান করতে হবে। টেলিগ্রাম এল সকালে, রওনা হতে হবে রাত্রেই। শচীনের মায়ের বিয়ের আশীর্বাদী একখানি ভিক্টোরিয়ার আমলের গিনি বিক্রি ক'রে কেনা হ'ল ট্রেনের টিকিট। দূর নির্বান্ধব দেশে ছেলেকে পাঠাতে হবে ভেবে মা-র মন বিমর্ষ। কিন্তু সেদিন রাত্রে শচীন ট্রেন ধরতে পারল না, কারণ ট্রেনের সময় আধঘণ্টা এগিয়ে গেছে। তাকে ফিরে আসতে দেখে, অজানা দুশ্চিন্তায় মা-র শরীর কাঁপতে লাগল ; নিষ্প্রাণ কণ্ঠে তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—"চাকরিটা তা হ'লে গেল?" এ যেন প্রশ্ন নয়, এ যেন স্বপ্নভঙ্গের হাহাকার, যেন ভেঙে যাচ্ছে পাকাবাড়ির স্বপ্ন, ছেলের জন্য রাজলক্ষ্মী বউ আনার স্বপ্ন। আপাদমস্তক ভিজে-যাওয়া ছেলেকে কাপড়-বদলাবার কথা বলতে ভুলে গিয়ে মা ব্যাকুলভাবে শুধোলেন, "আর কোন ট্রেনে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না? সত্যি?" মায়ের এই আকুল প্রশ্ন তাঁর মনস্তত্ত্বের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে এবং পাঠককে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয় যে, 'চাকরি তথা বিত্তের জন্যই পুত্র মা-র কাছে প্রিয়।' উপলব্ধিটি রূঢ়, কিন্তু সত্য। তাহলে 'সাহেবের মা' গল্পে বাৎসল্যের যে অনুভবগুলি আছে, সেগুলি কি সত্য নয়?—হ্যাঁ, সেগুলিও যথার্থ, অতএব সত্য। সাহেবের মা-র তিনটি ছেলে মেনাজ, ইছব আর সদরালি। 'সাহেব' নামে কোনো ছেলে নেই অবশ্য। তিনটি ছেলেই মারা গেছে ক্ষিদের জ্বালায়, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে। তাদের আধপাগলী মা বর্তমানে ঠোঙা বানাবার কাজ ক'রে মজুরি আর মাগনা খাবার পায়। খাবার পেয়ে সে—"হামড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের পাতের উপর। ভাবে, খাওয়াটা কত সহজ, কত জানা জিনিস। ধান কেঁড়ে চাল ফুটিয়ে ভাত, ফেনালো ভাত, আর যদি দাও একটু নুনের ছিটে। আর না-খাওয়াটা কত রাজ্যের পথ, আর কী নির্জ্জন সে পাথরের রাস্তা! তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হয় সাহেবের মা-কে, আর সবাইকে পিছে ফেলে। খিদের তাড়নায় নয়, ভূতের তাড়নায়। তিনখানা কঙ্কালসার হাত তার দিকে হঠাৎ এগিয়ে এসেছে।"—এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতেই পারে, যে, এ আর নতুন কথা কী! ঐ সময়ের লেখকেরা তো জীবনের ঐ রুক্ষ দিকগুলোকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। তবে, গল্প এখানেই শেষ হয়নি। এই সাহেবের মা যখন মহকুমার হাকিম ওরফে সাহেব-এর মুখে শোনে, যে, তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, তখনই আধপাগলী সাহেবের মা'র মনে হয়, এই তো তার ছেলে সাহেব, ক্ষিদের সময়ে ঠিক মায়ের কাছে এসে হাজির। কষ্টার্জিত পয়সায় কেনা বাতাসা আর চিনির মঠের ঠোঙা সে এগিয়ে দেয় তার সাহেবের দিকে। গল্পটি অবশ্য এখানেও শেষ হয়নি, কিন্তু পঠিত অংশ থেকে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে ওঠে, যে, জীবনের নেতিবাচক দিকগুলিই সব নয়, কিছু কিছু সদর্থক দিকও আছে।

একটি আকর্ষণীয় গল্প 'সাক্ষী'। এ গল্পটি আমাদের কমলাকান্তের অনবদ্য জবানবন্দীর

কথা মনে করিয়ে দেয়। মফস্বলের আদালতের বর্ণাঢ্য চিত্রটি অচিন্ত্যকুমার এঁকেছেন স্বীয় অভিজ্ঞতার সহায়তায়। গল্পটি এ-ই যে, ষষ্ঠী ভট্টাচার্য জমির দখল পাবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দুর্লভ প্রামাণিককে নিয়ে চলেছে আদালতে। দুর্লভ চতুর লোক, অতএব এই সুযোগে সে ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছে, ভিড়ের ট্রেনের মধ্যেও শোবার জায়গা, সিগারেট, ছিটের হাফশার্ট, নকল হীরের বোতাম ; তবু আফ্‌সোস, যে, লণ্ঠন, টেপাবাতি, আর ছাতা হল না। শেষকালে সিল্ক-ফিনিশ রঙিন চাদর একখানা আদায় না হওয়াতে তার মন এতই দমে গেল, যে, বিপক্ষের উকিল জেরায় তাকে ঘায়েল করে ফেললেন। সেই অপরূপ সাক্ষ্য উদ্ধৃত হবার যোগ্যতা রাখে। বিপক্ষের অভিজ্ঞ তথা চতুর উকিল কৈলাসবাবু দুর্লভের কাছে জানতে চাইলেন, যে, নালিশী জমিটি থেকে নৌকোয় দুর্লভের বাড়িতে যেতে কত সময় লাগে। এ প্রশ্নের উত্তর দুর্লভকে শেখানো হয়নি। কিন্তু তার উপস্থিত-বুদ্ধি যথেষ্ট, তাই সে হাল ছাড়ল না, পাল্টা প্রশ্ন করল—

"আচ্ছা, গোনে না বেগোনে?"

"ধরুন বেগোনে।"

"উজানে না পিঠামে?"

"ধরুন পিঠামে।"

"দিবসে না রজনীতে?"

"ধরুন রজনীতে!"

"দুর্লভ মরিয়া হয়ে বলে উঠল : "ও আমি কেন, আমার ঠাকুর্দ্দা এলেও বলতে পারবে না।"

"তা'হ্‌লে আপনি বলতে পারেন না জমি সোনাউল্লো করত কি তার চাচা করত।"

"জমিতে পৌঁছিয়েই দিতে পারলেন না, তায় বলব কি ক'রে, কে করে?"

দুর্লভের মত চরিত্র সত্যই দুর্লভ। বেচারা ভট্টাচার্য মশাই অবিলম্বে এই অনবদ্য সাক্ষ্যের ফলাফল টের পেলেন। এছাড়াও আছে উভয় পক্ষের উকিলদের কার্যকলাপ, কথাবার্তা, যার মধ্য দিয়ে আদালতের প্রতিদিনকার কাহিনী রূপের সঙ্গতি লাভ করেছে।

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পগুলি তৃতীয় পর্বে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যার আরো নিকটবর্তী হয়েছে, এবং বৃহৎ জীবনকে উপলব্ধির মাধ্যমে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। কল্লোল যুগের গল্পগুলির মূলসুর যেমন খসেপড়া তারার গানের সঙ্গে মেলে, ঐ সব গল্পে যেমন প্রেম-না-পাবার যন্ত্রণার কথা থাকে, পুরোনো সব সংস্কারের প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি হানা হয়—এইসব লক্ষণ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে তৃতীয় পর্বের এই গল্পগুলি। পঞ্চাশের মন্বন্তর, এবং ফলত অন্নবস্ত্রের অভাবে জনগণের দুর্দশা-র ছবিই প্রধানত রূপ পেয়েছে এখানে। এক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের সংযম লক্ষণীয় ; তিনি কবি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাবালুতার বন্যা বইয়ে দেননি, দুঃখকেও সংযমের সীমাতেই বেঁধেছেন।

'বস্ত্র' গল্পের বড়ো ছাদেম ফকির বাড়ি বাড়ি দুধ দিত। বস্ত্রের অভাবে, সভ্যসমাজে হাজির হতে না পারায় তার জীবিকা বন্ধ হয়ে গেল। তার পরনের কাপড়টুকু প্রথমে হয়ে দাঁড়াল কোমরের নিচে একহাত ন্যাকড়ার ঘের, সেটা আস্তে আস্তে হল নেংটি। তারপর

একেবারেই বস্ত্রহীন অবস্থা। তার স্ত্রী এবং বিধবা পুত্রবধূর অবস্থাও তদ্রূপ। ছাদেম অন্ধকারে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায় কাপড়ের সন্ধানে। দয়াপরবশ হয়ে একদিন একজন একখানা নতুন কাপড় পাঠিয়ে দিলেন তাকে। পরদিন জানা গেল নতুন কাপড়ের ফাঁস গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে ছাদেম। কারণ, ঐ কাপড়খানা বড়জোর দু'খণ্ড করা যায়—কিন্তু কাপড় দরকার তিনজনের। তাই ছাদেম সরিয়ে নিল নিজেকে। তার দেহ লাশখানায় নিয়ে যাবার পর নতুন কাপড়টি দুটুকরো ক'রে পরে কান্নাকাটি করতে লাগল তার স্ত্রী ও পুত্রবধূ। কাপড়ের অভাবে এতাবৎ তারা সভ্যসমাজে শোক প্রকাশের সুযোগ পায়নি। বস্ত্রের মন্বন্তর মানুষকে কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, এ তারই ছবি।

অভাবের জ্বালায় এদের মত কেঁদে উঠে শোক প্রকাশেরও সুযোগ পায়নি 'বাঁশবাজি' গল্পের বুড়ো মন্তাজ। বাঁশবাজি তার পেশা। পেটের ওপর রাখে একটা বাঁশ, তার ডগায় উঠে খেলা দে· য় তার বড়ছেলে ইন্তাজ। একদিন অনাহারজীর্ণ দেহে মন্তাজ বাঁশের ভারসাম্য ঠিক ঃ খতে না পারায় ইন্তাজ ছিটকে পড়ে এবং মারা যায়। ছোট ছেলে আক্কাছ বোঝে, এবার তার পালা। দেওয়ালে পিঠ-ঠেকে-যাওয়া নিরুপায়তায় সে ভীতকণ্ঠে আর্তনাদ করে 'এবার আমার পালা। আমি নিঘ্‌ঘাত পড়ে যাব, মরে যাব আমি।" মন্তাজ পাথুরে নির্লিপ্ততায় চুপ ক'রে থাকে, ছেলের ভয় দূর করতে কোনো ভরসা দেয় না। কারণ সে নিরুপায়। ছোট ছেলেটাকেই এবার বাঁশে তুলে, খেলা দেখিয়ে, পেট চালাতে হবে। মন্তাজের তো কাঁদবার সুযোগ নেই! দারিদ্র্যের চাপে, জীবিকার অন্বেষণে, মানুষ হৃদয়হীন অমানবিকতার গহন পাতালে কীভাবে তলিয়ে যায়, এ গল্পে তারই সাক্ষ্য আছে।

'দাঙ্গা' বা 'নুরবানু'—এইসব গল্পে মনস্তত্ত্বই প্রধান—চূড়ান্ত মুহূর্তে মানুষের আকস্মিক মনপরিবর্তনের লীলারহস্যই এগুলির উপজীব্য। আদমপুর আর ধুলেশ্বর—এই দুই গাঁয়ের মধ্যিখানে শিশেখালের ওপরের বাঁশের সাঁকোতে দুই গাঁয়ের দুই ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ। জিন্নাত গহরালির ছেলে, মকবুলের মেয়ে মমিনা। দুজনের মিলন হতে পারত, কিন্তু দুই গাঁয়ের বিরোধে তা হল না। গহরালির দল হেরে গেল মকবুলের দলের কাছে, জিন্নাত হল বন্দী। রাত্রিবেলা মমিনা চুপিচুপি তার কাছে গিয়ে বাঁধন খুলে দিল, আর পরামর্শ দিল যেন জিন্নাত মমিনাকে সঙ্গে নিয়েই পালায় এবং বিয়ে করে—এতেই দু গাঁয়ের বিরোধ মিটে যাবে। জিন্নাত রাজি হল। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে ডাক দিয়ে উঠল তার শিরায় প্রবাহিত বাপ-ঠাকুর্দার রক্ত। তার গোষ্ঠীচেতনা তাকে জানিয়ে দিল, সে মরদের বাচ্চা। মমিনার কারণে সেই গোষ্ঠীগত সম্ভ্রম সে বিসর্জন দিতে পারে না।

'নুরবানু' গল্পে মুসলমানী বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা এবং পুনর্বিবাহের নিয়ম বলা আছে। এর গল্পাংশ এইরকম—দরিদ্র বর্গাচাষী কুরমান তার সুন্দরী স্ত্রী নুরবানুকে মনিববাড়িতে কাজ করতে পাঠায়। মনিব উকিলদ্দি দফাদারের কুনজরে পড়ে বধূটি এবং একথা জানতে পেরে কুরমানের মনে নানারকম সন্দেহ জাগে। একদিন এক উত্তেজিত মুহূর্তে সে নুরবানুকে তালাক দেয়। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে সে নুরবানুকে ফিরে পেতে চায়। কিন্তু সামাজিক প্রথানুযায়ী অন্য কেউ নুরবানুকে নিকাহ্ ক'রে তালাক দিলে তবেই কুরমান ও নুরবানুর পুনর্বিবাহ হতে পারবে। উকিলদ্দি এই সুযোগে নুরবানুকে নিকাহ্ করল। কিন্তু

তালাক দেবার আগে সে একরাত্রি সহবাসের সামাজিক দাবি জানাল, যা মানতেই হ'ল নুরবানুকে, এর পরেই কুরমান অস্বীকার করল তাকে বিয়ে করতে। দৈহিক সতীত্বের চেয়ে পাতিব্রত্য যে নুরবানুর কাছে বড়, সে যে সেই কারণেই উকিলদ্দির কাছে দেহ সমর্পণে বাধ্য হয়েছে—এ ব্যাপারটি কুরমান আদৌ উপলব্ধি ক'রতে পারল না ; ফলে উভয়ের দাম্পত্য জীবনে মিলনান্ত পরিণতি আসার সুযোগ পেল না।

'মাটি' গল্পে চেতনার শিকড় আর আসক্তির গভীরতা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। চাষী আমানতের জমি ছিল সত্তর বিঘে। উচ্চশিক্ষার্থী পুত্র আজিজের পড়ার খরচ, এবং পাশ করার পর তার চাকরি পাবার জন্য ঘুষের খরচ যোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আমানত। তার আশা, একদিন আজিজ বিয়ে ক'রে অনেক ছেলেপুলের বাবা হবে। তখন নাতিরা আর ঠাকুরদাতে মিলে গ্রামে আবার গড়ে তুলবে নতুন ক্ষেতখামার। এ আশা পূর্ণ হল না। সদরে চাকুরিরত আজিজ বাপকে নিয়ে গেল শহরে। সেখানে আমানতের মন শান্তি পায় না, সে তামাকে স্বাদ পায় না, তার হাত-পা অনড় হয়ে আসে। কেবলই মনে হয়, বৃদ্ধা-স্ত্রীকে তালাক দিয়ে যদি নবযৌবনা কাউকে বিয়ে করতে পারত সে, জন্ম দিতে পারত রাশি রাশি পুত্রসন্তানের—তারা একসঙ্গে মিলে মাঠে লাঙল দিত, সবুজের ঢেউ তুলে দিত দিগন্ত পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে এসব কিছুই হয় না। গাঁটের বাত এড়াতে ছেলে বাপকে কিনে দিল সেলাইয়ের কল। আমানত বৃত্তি বদল ক'রে খলিফা হয়ে গেল। কিন্তু এখনও যেদিন আকাশ কালো ক'রে আসে আর টিনের চালার ওপর ঝমাঝম বৃষ্টি হয়, তখন মনে হয় বৃষ্টিটা যেন কান্নার শব্দ—

"আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে—ডাকে—অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।" যে স্বপ্ন বাস্তবের মুখ দেখল না, সে স্বপ্ন পাঁজরের আরো গভীরে প্রবেশ করতে থাকে।"

অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনে যেন উদার ছিলেন, তেমনই খুঁতখুঁতে ছিলেন ভাষা তথা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। শব্দের ব্যবহারকে অমোঘ ক'রে তোলবার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন তিনি। অনেকসময়ে চরিত্রের মুখের সংলাপের সাহায্যেই চরিত্রটিকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন তিনি। যেমন 'অকারণ' গল্পে এক নিঃসঙ্কোচ অফিসারিকা-র (তাঁর ব্যবহৃত শব্দ) অলজ্জ চালচলন ভালো না লাগায় স্থানীয় অন্য মহিলারা পরচর্চার আসর বসান। ঐ আসরে নরেন মাস্টারের স্ত্রী উক্ত অফিসারিকা-র পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে সতেজে বলেন,—"আগো, থোন ফালাইয়া। জানা আছে ঐ পোলার বিদ্যা। এইবার হাপিয়ালি পরীক্ষায় অঙ্কে পাচ পাইছে। পাচ।" এই বক্তব্যের পরে ঐ সু-ভাষিণী পাঠকের চোখের সামনে হাজির হন। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সেই পুরোনো কথাটি—"সংসারের নিয়ম না মানলেও গল্পটি এমনভাবে গড়তে হয়, মনে হবে যে দেখতে পাচ্ছি।"

অচিন্ত্যকুমারের গল্পে উচ্চবর্গীয় ও নিম্নবর্গীয় মুসলমান চরিত্রের প্রাধান্য আছে। এইসব গল্পে সঠিক আবহ গড়ে তোলার উপযুক্ত শব্দ সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। যেমন—

ভুকসানা, ল্যাই, খাওন-পিরন, ছুটা খত, কাবেজ, লোয়াজিমা, ছোলেনামা, কেরায়া-নৌকা, ফেরেবী, বেমালেক দায়াদী, তজ্‌দিগ, দাদ-বেদাদ, ইদ্দত কাবার, হালাল, কলমা, বেতমিজ, জুম্মাবার, আসমান, কসুর, কাবিল প্রভৃতি। উপমা প্রয়োগের ধাঁচও প্রথম পর্বের গল্পে একরকম, আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব অন্যপ্রকার। প্রথমদিকে ব্যবহৃত হত কাব্যিক উপমা। যেমন "মেয়েটি একটি লাবণ্যের নদী" (ইতি)। পরের দিকের উপমাগুলি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা—

(ক) "আজ কাঁচের চুড়ি, কাল আংটি চুংটি, নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে।" (নুরবানু)

(খ) "চৈতী মাঠের মত বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে....।" (নুরবানু)

(গ) "সোতের শেওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে।" (সারেঙ)

(ঘ) "পাখির নখের মত চোখ" (জমি)

আমরা 'পাখির নীড়ের মত' উষ্ণতায় ভরা চোখের কথা শুনেছি, এবার দেখছি আমিরনের 'পাখির নখের মত' ধারালো চোখ। সে নজর রেখেছে, যাতে কেউ তাদের জমি জবরদখল করতে না পারে।

প্রবাদ-প্রবচনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হ'য়েছে তাঁর গল্পে—এবং তার মধ্যে অনেকগুলিই পরিচিত হয়েও অপরিচয়ের স্বাদ আনে, কারণ সেগুলি বলা হয়েছে আঞ্চলিক ভাষায়। যথা—

(১) "যা হয়ে গেলছে, তা বয়ে গেলছে।" (গঙ্গাযাত্রা)

(২) "গত কম্মের বিধি নাই"। (ঐ)

(৩) "দামুর কথা ছামু ছামু।" (ঐ)

(৪) "যে এল চষে সে থাক বসে
নাড়াকাটাকে ভাত দাও, খাক ঠেসে ঠেসে।" (ঐ)

(৫) "সারেঙ শুঁটকি দরগা
এ তিন নিয়ে চাটগাঁ।" (সারেঙ)

(৬) "কাঁধে আসে কাঁধে যায়, উলটে পড়ে মার খায়।" (মুচি বায়েন)

(৭) "পীরের চেয়ে খাদিম জিন্দে।" (মুচি বায়েন) ইত্যাদি

অচিন্ত্যকুমারের রচনায় 'Pun'-এর দর্শন মেলে বহুল পরিমাণে ; আর এতে ক'রে গল্পের পাঠযোগ্যতার মাত্রাটি বেড়ে গেছে বলেই মনে হয়। যেমন—

(১) "অভিনয় আমরা চাই বটে, কিন্তু অবিনয় নয়।" (ইতি)

(২) "তোমার টেন্সজ্ঞান আমার টেনশ্যান্ কমিয়ে দিয়েছে।" (অরণ্য)

(৩) "ও ভ্রমে ভ্রমর নাম নিয়েছে।" (অরণ্য)

ভাষায় গতি আনতে ও ভাবকে দ্যুতি দিতে শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি। তারই একটি নমুনা : "ঝাঁপস"—অর্থাৎ "ঝাঁ ক'রে আপস।" "অসংখ্য চোর" বোঝাতে বলেছেন "চোরের অক্ষৌহিণী"। তাঁর রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যও নজরে পড়বে, যদি গল্পের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হয়। যেমন 'অরণ্য' গল্পের ভ্রমর বলে—

"আমি ফোরসাইট সাগা পড়লেও বুঝিনি, আমি Irene-ও নই, Fleur-ও নই—কিন্তু জান কি ক্ষিতিদা, আমার স্বামী স্বামীই বটে, বন্ধু নন—বহু তপস্যার স্বামী ; বিনা মূল্যের বন্ধু নন।" অথবা, পুস্তক প্রীতিসম্পন্ন এক বন্ধু মৃত্যুশয্যায় ; তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—"সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশান্তি। শিয়রের ধারে খান কয়েক বই,—আত্মীয়ের মত স্তব্ধ বেদনায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে...।' (দুইবার রাজা)

তাঁর গল্পে কখনো কখনো উপস্থিত উচ্চবিত্ত ও শহুরে মধ্যবিত্তরা। তবে অধিকাংশ গল্পেই আছে হাড়ি হাজরা, সরলা, গোরাশশী, কুরমান, সোনামদ্দি, আমিরন, বেগুনি, রাজু নাপিত, অমর, ছাদেম ফকির, মন্তাজ, আমানত, নেকজানের মা, সরবানু, ভবতোষের মত লোকেরা—যাদের বিষয়ে জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৬-৪৭ কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলি খুব মানানসই মনে হয়—

"জীবনের ইতরশ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে।"

কখনো বা এদের অবস্থা আরো খারাপ। কারোর অন্ন নেই, কারোর বস্ত্র নেই, কারোর সামাজিক মর্যাদা নেই, কারোর জমি নেই, কারোর নেই স্বামীর সোহাগ। এদের বর্ণনায় বা সংলাপে অচিন্ত্যকুমার তাই সঠিক আবহ তৈরির শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন, যেমন—

থেটার-বাড়ি, তেরিবেরি, প্যাঁকাটির মত লিকলিকে দেহ, নুটিশ, ভাঁওতা মেরে দেওয়া, কাঁকড়ার মত কুঁকড়ে, ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল, শত্রুতালি, হামলা-হামলি—ইত্যাদি। পূর্বোক্ত মানুষগুলির চেহারাপত্র, কথাবার্তা—এ সবই অচিন্ত্যকুমারের কলমে বেশ মানানসই হয়ে উঠেছে। যেমন, 'ক্লোজ আপ' গল্পে ভাবী আর্ট-ডিরেক্টর শশাঙ্কর বর্ণনা এই প্রকার :

"বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, চেহারা দেখলেই ঠাহর হয় অনেক ঘাটের নৌকা, চোখে মুখে একটা তীব্র হঠকারিতা।"

'বাঁশবাজি' গল্পে ক্ষুধার্ত মন্তাজের জঠরদেশ এইভাবে চিত্রিত—

"পেট বলে কিছুই নেই আর বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে খেতে খটখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরুনি।"

জীবনের যুদ্ধে পরাজিত মানুষ এরা সব। বস্তুত, তাঁর অনেকগুলি গল্পই আসলে পরাজিত মানুষের গল্প। 'দুইবার রাজা'র অমর পরাজিত হয় অনটন-ব্যাধি ও মৃত্যুর কাছে। 'মাটি'র আমানতের স্বপ্ন ছিল পুত্র আজিজের উচ্চশিক্ষা নিশ্চয় তার ৭০ বিঘা জমির সীমানাকে আরো বাড়িয়ে দেবে—কিন্তু সমূলে উৎপাটিত হয় স্বপ্নের শিকড়। 'জমি'র আমিরন চায় নিজেদের জমির দখল বজায় রাখতে, এবং তারই পরিণতি হিসেবে তাকে চলে যেতে হয় জলিল মুন্সীর দখলে। হরেন্দ্রর মনিব চেয়েছিলেন হরেন্দ্রর সঙ্গে সন্ন্যাসী হালদারের মেয়ে বেগুনির বিয়ে হোক। কিন্তু হল না। কারণ প্রথমত হরেন্দ্র কন্যাপণের

ছ'কুড়ি টাকার সংস্থান করতে পারল না, এবং দ্বিতীয়ত পিতৃগৃহ থেকে অপহৃতা অর্থাৎ সমাজচ্যুতা বেগুনিকে বিয়ে ক'রে জ্ঞাতিকুটুম্বের রোষভাজন হবার সাহস হরেন্দ্র দেখাতে পারল না।

'তিরশ্চী' গল্পের কুদর্শনা নায়িকা সুমিতা প্রেমের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এক সম্ভাবনাময় সুপাত্রকে। কিন্তু ঐ প্রেমের আদর্শের ধ্বজা চিরকাল ঊর্ধ্বে রাখতে পারল না সে, বিয়ে ক'রতে বাধ্য হল অনির্বাচিত পাত্র পশুপতিকে, যার স্বভাবে আছে চৌরবৃত্তি। স্বামীর উক্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে সুমিতাকেই যেতে হয় হাকিমের কাছে, রাত্রিবেলায়। এই হাকিম সেই সুপাত্র—যাঁকে একদিন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। 'তিরশ্চীন্' শব্দের অর্থ oblique—অর্থাৎ তির্যক। 'তিরশ্চী' বিশেষণটিও সম্ভবত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন বোঝানো হয়েছে, জীবন এইভাবেই মানুষের চলবার সরল পথকে বাঁকিয়ে দেয়। যে আজকে মহৎ, সে কালকে কঠিনচিত্ত হয়ে উঠতে পারে। আমরা অনেকেই ক্ষণিকের জন্য সাহসী হতে পারি, বরাবরের জন্য পারি না। তাই এ গল্পের শেষে দেখি, একদিন যে সুমিতার প্রত্যাখ্যানের অনুরোধ মেনে নিয়েছিল, সেই মানুষটি আজকে সুমিতার স্বামীকে ক্ষমা করার অনুরোধ অক্লেশে নাকচ করে দিল। সমাজের পরোক্ষ চাপের কাছে সে নিজের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। সে হেরে গেছে সব দিক দিয়ে।

'হাড়ি হাজরা' গল্পের নামচরিত্রটি আর একজন পরাজিত মানুষ। সে থাকে তার বৌ কুড়োমতির দাইগিরির উপার্জনের ভাতে, এমনকি একদিন একটু গরম ভাত খেতে চেয়েও সে পায় পান্তা ভাত, এবং কুড়োমতি তাকে শুনিয়ে দেয়, "আমার গরম না খেলে চলবে কেনে? আমাকে খেয়ে-মেখে বাঁচতে হবে তো? ওজকার করতে হবে তো?" এমনি রোজদিন, বউয়ের কাছে নিনু হ'য়ে থাকে সে। একদিন হঠাৎ পূর্ণশশীদের বাড়িতে অপ্রত্যাশিতভাবে অপমানিত হল কুড়োমতি, একুশ দিন আগে যে পূর্ণশশীর ছেলে হয়েছে কুড়োমতির-ই হাতে! সে এসে স্বামীর কাছে সব কথা বলে অপমানের প্রতিকার চাইল। অমনি দূর হয়ে গেল হাড়ি হাজরার নিনুভাব। সে ডাকাতদের মত মুখে 'আবা' দিয়ে বিকট আওয়াজ ছাড়ল। লাফ দিয়ে হাতের খেঁটে ঘোরাতে লাগল বনবন করে। এইবার একটা সুযোগ এসেছে, তার 'ল্যালা, আবাঙ, উদোমাদা' এই বদনামগুলো দূর করে দেবার। এমনকি, কুড়োমতিও তাকে গরম ভাত খেতে দিলে। কিন্তু হায়, পরাজিত মানুষটি আবারও পরাজিত হল কুড়োমতিরই জন্যে। কারণ তখনই আর এক বাড়ি থেকে পোয়াতি-খালাসের ডাক এল। হাড়ি হাজরা গর্জন ক'রে আপত্তি জানালেও, সে আপত্তি টিকল না। আবারও পরাজয়ের স্বাদ পেল সে। এত সাধের গরম ভাত পড়েই রইল অস্পৃষ্ট হয়ে। 'ধন্বন্তরি' গল্পে দেখি মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ডাক্তার পরাজিত, সে তার রোগী রেবতীকে বাঁচাতে পারেনি। একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে 'গার্ডসাহেব' গল্পের নিবারণ। মালগাড়ির তুচ্ছ গার্ড সে ; রেল কোম্পানীর এমনই আইন, নিজের বিবাহবার্ষিকীতেও ছুটি পাবার সুযোগ নেই তার—ঐ রাতেও তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় 'ডিউটি'-তে। মৃত্যুর কাছে, জীবিকার্জনের কাছে, সমাজের কাছে, পরিস্থিতির কাছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কতভাবেই না পরাধীনতার দাসখত লিখে দিয়েছে।

কিন্তু, তবু তো সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। তাই 'ধন্বন্তরি' গল্পের রেবতীর মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি তাকে বাঁচাবার জন্য ডাক্তারের যে আপ্রাণ চেষ্টা, সেটাও তেমনই সত্য।

অচিন্ত্যকুমারের গল্পে কেমন আছে ছোটরা? যাদের বয়স মোটামুটি ছয় থেকে বারোর মধ্যে? না, তারাও ভালো নেই, কারণ তাদের শৈশব চুরি গেছে অসময়ে। দু-একজনের কথা বলা যাক।

(১) সরল, যাকে জেলের হাসপাতালে চিকিৎসা করাবার সুযোগ পাবার জন্য নানা ছুতোয় বারে বারে জেলে আসতে হয়। (আরোগ্য)

(২) প্রহ্লাদ, যশোমতীর ৮/৯ বছর বয়সের ছেলে। ছেলেটিকে তার বাবা ২০ টাকায় বিক্রি ক'রে দিয়েছে রজব আলির কাছে। ছেলে আর কোনোমতেই বাপের কাছে ফিরতে রাজি নয়। তার মতে "যে বাপ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, টাকার জন্য ছেলেকে বিক্রি করে দেয় মুসলমানের কাছে, মা বলেছে, সে বাপ বাপই নয়।" শুধু মা-র নয়, ছেলের মনের কথাও ঐ একই। তার বয়সের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক অনুভব এটি। (যশোমতী)

(৩) 'বাঁশবাজি' গল্পের ইন্তাজ ও আক্কাছ নামের বালক দুটির কথা আগেই বলেছি। নিরুদ্বেগ শৈশব নেই তাদের, পরিবারের মুখে অন্ন যোগাবার দায় তাদের ওপরেই বর্তেছে। ইন্তাজ বাঁশ থেকে পড়ে যায়, এবং মারা যায়। এবার আক্কাছের পালা। না হয় বাঁশ থেকে পড়েই মরবে, না হলে যে অন্নাভাবে সে আর তার বাপ দুজনেই মরবে!' (বাঁশবাজি)

(৪) নাসিম, যার বয়স ১০ কিংবা ১২। (তার বাবা নেই)। মা গোলবানুর পুনর্ব্বিবাহে তার খুবই আপত্তি। তবু এ বিয়ে হয়, এবং সৎ-বাপ গহরালি নাসিমকে তুচ্ছ কারণে বেদম প্রহার করে। গহরালিকে এই প্রহারের সুযোগ ক'রে দিয়েছে বলে নাসিম মনে মনে তার মা-কে ঘৃণা করে এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় এক স্টীমারে। সেখানকার সর্বময় কর্তা সারেঙের চাকররূপে, শুধু খাওয়ার বিনিময়ে নিযুক্ত হয় সে ; কাজে সামান্য ত্রুটি হ'লেই বেধড়ক মার খায়। তবু এটা তার নিজেরই নির্বাচিত জীবন, তাই অসহায় নাসিম সব সহ্য করে। খুব কষ্ট হ'লে সে 'বাবা গো' ব'লে আর্তনাদ করে, মা-কে ডাকে না—বরং মা-র মরামুখের কথা ভেবে মনে জোর পায়। সারেঙ-এর মন জয় করার জন্য স্টীমার-এর যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরি করতে থাকে সে। এবং এইভাবেই টিঁকে থাকার যুদ্ধে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখে। একদিন, অজ্ঞাতসারে নিজেরই মায়ের গলার হার চুরি ক'রে সে যখন মার খাচ্ছে, তখন সারেঙ এসে তাকে বাঁচায়, 'নিজের ছেলে' বলে তার পরিচয় দেয়। এর পরেই নাসিমের মন থেকে গোলবানু সম্পূর্ণ মুছে যায়। যে তাকে চোরের মার খাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, সেই সারেঙের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় "দিনরাত করে যে সূয্যি, যেন তার মত চেহারা।" নাসিমের মধ্য থেকে কখনো কখনো সত্যিকারের ছেলেমানুষও উঁকি মারে। প্রথম স্টীমারযাত্রার রোমাঞ্চ সে সারা শরীর দিয়ে উপভোগ করে। কিন্তু একই সঙ্গে নিয়মিত চলাচল আস্তে আস্তে রোমাঞ্চকে মুছে দেয়। তবে এটুকুকে স্বীকার ক'রেও বলতে হবে, নাসিম বালক হলেও পরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। (সারেঙ)

(৫) কিশলয়, অমরের ছাত্র। কবিতা লিখতে ভালবাসে, বাবার কাছে আবদার করে, গৃহশিক্ষককে পছন্দ করে। মানুষ যে মরে গেলে তারা হয়ে যায়—তা বিশ্বাস করে। কিন্তু

এই সরল শৈশবকে সে বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি। তার বাবা-মা এবং এক কড়া ধাঁচের গৃহশিক্ষকের হাতে পড়ে সে প্রথমেই হারালো তার কবিতার খাতা তিনটে। তার মা গৃহশিক্ষককে বলে দিয়েছেন, ফের পদ্য লিখলে বেত মারতে। কিশলয়ের কচি মনটি এখন পাঠ্য বইয়ের তলাতেই চাপা পড়বে। (দুইবার রাজা)

(৬) 'রুষ' নামে পাঁচ বছরের বালকটি এই তালিকায় একমাত্র ব্যতিক্রম। সে আজ সকলের চেয়ে ছোট, তাই সে মাথায় সকলের চেয়ে বড় হতে চায়। তার অকালমৃত্যু খুব সহজেই তাকে অতীত ক'রে তোলে। (অরণ্য)

এ মৃত্যু তার শৈশবকে চির-অপরিবর্তনীয় করে দেয়।

একমাত্র রুষ ছাড়া আর কেউ নিশ্চিন্ত শৈশব পায়নি। বড় হবার পর ছেলেবেলার দিনগুলিকে তারা খুব আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করবে না।

অচিন্ত্যকুমার যে যুগে লিখছেন, সেই যুগ বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক উদ্দামতায় দীর্ণ ও সংশয়াকুল। সাধারণ মানুষের মনের বিশ্বাস শূন্যে এসে ঠেকেছে। এ সময়ে স্থৈর্যের অভাবটাই সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বলে বিবেচিত হ'লে অবাক হবার কিছু নেই। বরং এতেই অবাক হতে হয়, যখন দেখি যে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে চিত্তের স্থিরতাই প্রকাশ পেয়েছে বেশিরভাগ সময়ে। পারিপার্শ্বিকের আক্ষেপে তিনি বিচলিত হন সত্য, তবু চিত্তের মধ্যে এমন এক প্রশান্তি-কে লালন করেন, যার দ্বারা বস্তু ও মানবচরিত্রের মর্মকে ছেঁকে ফেলা যায়। এই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ—কেরানী, সেরেস্তাদার, মুহুরী, দেহব্যবসায়িনী, বায়েন, চাষী, সারেঙ, দরিদ্র ছাত্র—আবার কখনো বা হাকিম / অফিসার / ডাক্তার / ফিল্মে অভিনয়েচ্ছু তরুণী—এরাই তাঁর গল্পের নায়ক। এদেরই মধ্যে অচিন্ত্যকুমার দেখেন জীবনের ব্যথা-বেদনা-সুখ-আনন্দকে। স্থিরতার চেতনা দিয়েই নানাপ্রকার বৈপরীত্যকে গেঁথে তোলেন তিনি। বৈপরীত্যই তো জীবন। তাই বেওয়ারিশ একটি বালকের মৃতদেহ আশ্রয় পেয়ে যায় ভূষণ ডোমের সস্নেহ কোলে, কারণ মৃত্যুর চেয়েও মমতা বড়। বিশেষত, অনাত্মীয়ের মমতা। বিবাহবার্ষিকী পালনে অক্ষম গার্ডসাহেব নিবারণ, যার জীবনযাপন বা মনোজগৎ—কোনোটাই তুচ্ছতার মাত্রাকে অতিক্রম করতে পারেনি, ভোরবেলার সূর্যোদয় দেখে সে-ই নিবারণের মনে হয়, যেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দুই হাতে জীবন ও মৃত্যুর খঞ্জনি বাজাচ্ছেন। রাত্রে বাঁধাবাবু অটলের জুতোপেটা খেয়ে ব্যথাজর্জর শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে, পরদিন ভোরবেলায় জেগে উঠে সূর্যোদয় দেখে দেহব্যবসায়িনী সরলার মনে হয়—

"ভোরের আলোয় মনে হচ্ছে যেন ওর কাছে ওর হিরণকুমার আসছে—মাথায় তার সোনার মুকুট, তাতে পাখির পালক গোঁজা।" (ইতি) যে রূপকথা সরলার জীবনে বাস্তবায়িত হল না, যে রাজকুমার কোনোদিনই এল না সরলার ঘরে—মনের মধ্যেই চলল তার আসা-যাওয়া। দেহ পরাধীন, কিন্তু মনের স্বাধীনতা কে ঘোচাবে? সেই স্বাধীনতার মধ্যেই পার্থিব দুঃখ থেকে মুক্তি। এই ইতিবাচকতা, এই বিশ্বাসের জোর অচিন্ত্যকুমারের গল্পে একটা আশ্বাসের আস্বাদ এনেছে। শিখিয়েছে আনন্দ-বেদনায় ভরা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে। এই-ই তো আমাদের আকাঙ্ক্ষার অধিক প্রাপ্তি।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)
২. ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড)
৩. ঐ (তৃতীয় খণ্ড)
৪. ঐ (চতুর্থ খণ্ড)
৫. স্বনির্বাচিত গল্প—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৬. অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প—অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের ভূমিকাসম্বলিত
৭. .কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৮. কথাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৯. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—বীরেন্দ্র দত্ত

সহায়ক পত্রিকাপঞ্জী :

১. 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।
২. বৈদগ্ধ্য, শারদ সংখ্যা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

‘আশ্রয়’-এর সন্ধানে দুটি চরিত্র

১

চরিত্র দুটি দুই ভিন্ন প্রদেশের। এবং ভিন্ন মানসিকতার। প্রাণপণে আশ্রয় খুঁজেছিল—এই-ই তাদের প্রধান মিল।

আশ্রয় তো সকলেরই চাই। যখন আদিম মানুষ থাকতো জঙ্গলে, তখনও জঙ্গল কিংবা গুহাকে সে আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আশ্রয় যে শুধুমাত্র মাথা গোঁজার একটা জায়গা, এ ধারণাও এখন আর সর্বাত্মক নয়। মানুষ মানসিক আশ্রয়ও খোঁজে। বোধহয়, সেইটাই বেশী ক'রে খোঁজে। কেন এত খোঁজাখুঁজি, এত অনুসন্ধান, তার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন। আসলে মনে হয়, মানুষ ধীরে ধীরে যত সভ্য হয়েছে, তত বেশী ক'রে সে চলে গেছে মনের আধিপত্যের এলাকায়। যার জীবন শুধুমাত্র ‘দিন আনি দিন খাই’-এর পুনরাবৃত্তি, সে বেঁচে থাকার দুশ্চিন্তায় এতই পীড়িত যে কোনোমতে মাথা গুঁজে থাকাটাই হয়তো তার ন্যূনতম চাহিদা। আর, যে মানুষ আর একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, এবং যার আছে একটি সংবেদনশীল মন, সে আশ্রয় বলতে বোঝে মাথার ওপরে ছাদ এবং নিরাপত্তা, যেখানে নিরুপদ্রবে, নিজের ইচ্ছেমত থাকা যায়।

যুগে যুগে এবং দেশে দেশে মানুষের অনেক রকমফের—তাই আশ্রয়ের ধারণাটাও হয়তো কিছু কিছু বদলে গেছে। এই বিষয়টিকে উপজীব্য করে কলম ধরেছেন অনেক সংবেদনশীল লেখক। তার মধ্যে দুটি হ'ল সিন্ধি ভাষায় রচিত শ্রীহরি মোটোয়ানির ‘আজো’, যার বাংলা অনুবাদের নাম ‘আশ্রয়।’ অপর গ্রন্থটির নাম ‘খানবদোশ’—পাঞ্জাবি ভাষায় লেখা—রচয়িতা শ্রীমতী অজীত কৌর—এবং বাংলা অনুবাদটি ‘জিপসি নদীর ধারা’ অভিধায় চিহ্নিত। এই বইটি থেকে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ‘যাযাবরদের তাঁবু’ নামে একটি বড় গল্প। গল্পটি আত্মজীবনীমূলক। মূল চরিত্র হলেন এক কথক। যিনি লেখিকা স্বয়ং। ‘আশ্রয়’ উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে ‘মোহন’ চরিত্রটি। ‘আশ্রয়’-এর সন্ধানে এই দুটি চরিত্র যে গোলকধাঁধায় ঘুরেছে এবং ঘুরেছে, তার প্রকৃতি এবং স্বরূপই আমাদের আলোচ্য নির্ণয়।

১৯৪৭-এর দেশবিভাগ আমাদের দেশের বহু মানুষের আশ্রয়চ্যুতির কারণ। নতুন যে দেশ তৈরী হ'য়েছিল, তা ভারতকে দুটি দিক থেকে ভৌগোলিকভাবে স্পর্শ করেছিল। একদিকে যেমন পূর্বপাকিস্তান থেকে বহু শরণার্থী তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস্তু ত্যাগ ক'রে অসহায়ভাবে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশ থেকে অনেক মানুষকে চলে আসতে হ'য়েছিল একই কারণে এবং একইভাবে। কিন্তু তাঁদের স্মৃতিতে র'য়ে গিয়েছিল, পূর্বের আশ্রয়ের ছাপ। নতুন দেশে এসে, প্রথমদিকে প্রতিকূল এবং পরে অনুকূল পরিস্থিতি লাভ করলেও ‘আশ্রয়’ শব্দটি তাঁদের কাছে হ'য়ে উঠেছিল যেন এক স্বপ্নজগতের দ্যোতক—বাস্তবের যত পরাজয়, অসাফল্য ও গ্লানি যেন দূর হ'য়ে যায় সেই জগতে।

২

'আজো' একটি সিন্ধি শব্দ। বাংলায় এর নিকটতম প্রতিশব্দ 'আশ্রয়'। এই বিশেষ শব্দটিই কাহিনীর নায়ক মোহনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মগুলির নিয়ন্ত্রক। মোহনের বাবা আলমচাঁদ সিন্ধুপ্রদেশের এক সচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। দেশভাগের পর তাঁকে চলে আসতে হ'ল বরোদায়। এখানে এসে প্রথমে জুয়ার নেশাতে তিনি হাতের টাকা শেষ ক'রে পরে হাত দিলেন স্ত্রীর গহনাতে। সেই মনোকষ্টে মেয়ে ও ছেলেকে ফেলে রেখে স্ত্রী অকালে গত হ'লেন। আলমচাঁদ পুনরায় বিবাহ ক'রে আরও দুটি সন্তানের জনক হলেন। দয়াভাই পাতিলের বিড়ি বাঁধবার কারখানায় কাজ নিলেন তিনি—অবশ্য তাতে সংসার চলত না। অগত্যা বারো বছরের মোহনকে পড়াশোনা ছেড়ে কাজে নামতে হল। সাংসারিক দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তার কাঁধে। বাবাটি স্বার্থপরের মত জুয়াখেলা চালিয়ে গেলেন। ২৪ বছর বয়সে মোহন মালিকের কাছে গেল টাকা ধার চাইতে—বিয়ে দেবে ছোটো বোনের। তাকে ফিরে আসতে হ'ল ব্যর্থতা ও তিক্ততা বহন ক'রে। টাকা তো মোটেই পাওয়া যায়নি, তদুপরি শুনতে হয়েছে কিছু কটু কথা—..."তোমাকে চাকরি দিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি বলে তোমার প্রতিটি দাবি আমাকে মেনে নিতে হবে? তোমরা সিন্ধুদেশ থেকে পালিয়ে এসেছ, এখান থেকে পালিয়ে গেলে টাকা কে শোধ করবে?"

—মোহন জানে, তাদের পালিয়ে আসাটা কোনো মজার বিষয় নয়। একটা লাঞ্ছনার বিষয়। তারা চলে আসতে চায়নি, তবু আসতে হ'য়েছে। এখন এই মালিকও মনে ক'রে সে এদের আশ্রয় দিয়েছে! আশ্রয় তো দেয় দেশ, আশ্রয় দেয় ভূমি। তাছাড়া, এদেশই এখন তার স্বদেশ। কিন্তু সেখানে যদি আজীবন আশ্রিতের ভূমিকা বহন করতে হয়, তাহ'লে তো সে-জীবনটা চিরকালের জন্য আঁধারে ঘেরা! চব্বিশ বছরের তারুণ্য তা মানতে রাজি নয়। সে চাকরি ছেড়ে দিল। অন্য কাজ পেল বটে, তবে একই কারণে তাও ছাড়তে হ'ল। সব মানুষের কাছে নিজের দেশই হ'ল সকল দেশের রানী। সে দেশের ভূমি আর নিসর্গকে মানুষ আপন ক'রে নেয় নিজের শ্রম দিয়ে। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে এমনভাবে আপন ক'রে নেয় যে জীবনসংগ্রামে প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে সহযোগী যোদ্ধা। কিন্তু যদি এর কোনোটাই না হয়, যদি বারে বারে সহ্য করতে হয় পলায়নবাদিতার অপমান, তাহ'লে সে দেশ আপন হ'য়ে ওঠে না। অপরপক্ষে অতীত তো বর্তমানের হাতে ধরা দেয় না! যা ঘটে গেছে, তাকে ফেরত পাঠানোও যায় না। বারে বারে তার প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা সামলাতে হয়। এমনকি যখন, মোহনের প্রেমিকা শোভার বাবা ভাবী জামাইকে একটি ফ্ল্যাট দিতে চান আশ্রয় হিসেবে, তখন এই সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উপেক্ষা ক'রে, এমনকি শোভার সঙ্গে তার সম্পর্কও অস্বীকার ক'রে সে চলে যায় মুম্বই। নতুন কাজের মালিকের সঙ্গেও অবিলম্বে তার বিবাদ বাধে। কারণ, প্রথমত, মালিক তাকে বলল মদে জল মেশাতে, যাতে মোহনের ব্যক্তিগত নৈতিকতায় নাড়া লাগল। প্রতিবাদ করতেই মালিক তাকে গালাগালি সহযোগে মারধোর করতে লাগল—"...নেমকহারাম, তোকে আমি চাকরি দিয়েছি, খেতে দিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছি...।" আশ্রয় দেবার ব্যাপারটি শোনামাত্র মোহন প্রতিবাদ করে, আরো মার খায় এবং শেষপর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে।

৩

মোহনের মনে নিশ্চয় একটা সমানাধিকারের চেতনা ছিল। ভারতবাসী হিসেবে সে সকলের সমান। তাহ'লে, কেউ তাকে আশ্রয় দিয়েছে, একথা হজম ক'রে নিলে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, যে, ভারত তার পক্ষে বিদেশ। অন্তত লোকে তাই-ই ভাবে। মোহনের মনে পড়তে থাকে, যে, তার দাদীমা দেশত্যাগ করবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তার তাৎপর্য অনেক পরে মোহনের হৃদয়ঙ্গম হয়। মুম্বইতে প্রহারের ফলে হতচেতন মোহন যখন হাসপাতালের শয্যায় সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পায়, তখন দেখে যে, শোভা বসে আছে তার পাশে। সুস্থ হয়ে উঠে সে শোভাকে নিয়ে যাত্রা করে সিন্ধুনগরে। এটা সিন্ধুপ্রদেশে নয়—ভারত ইউনিয়নের মধ্যেই সিন্ধিদের নিজের হাতে গড়ে নেওয়া শহর।

এর কারণ, সে অনুভব করতে পারছে, স্বপ্নের সেই দেশে আর ফিরে যাওয়া যায় না। বারে বারে কাজের জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়াও কোনো কার্যকর সমাধান নয়। এখানেই থাকতে হবে, যে মাটিতে মুখ থুবড়ে গেছে, সে মাটি ধরেই উঠে দাঁড়াতে হবে। এটা একধরনের সংগ্রাম—দীর্ঘকালীন এবং অবশ্যকরণীয়, তবেই তৈরী হবে স্বভূমি।

'যাযাবরদের তাঁবু' গল্পের নায়িকা অবশ্য মোহনের চেয়ে অনেক বেশীবার আশ্রয় বদলে বাধ্য হয়েছেন। পীর মক্কীর গলিতে নানীর বাড়িতে তাঁর জন্ম—ঐ গলিটা চলে গেছে রাবি নদীর দিকে। অবশ্য সেদিকের দরজা জানলা সবসময়ে চিক দিয়ে ঢাকা ; আর চিক তুলতে চাইলেই শুনতে হ'ত—"মেয়েদের ওরকম চিক তুলে দেখতে নেই।" তখন বালিকা অজীতের একটা সাময়িক দুঃখ হ'ত। কিন্তু পরে বুঝেছেন Morning shows the day প্রবাদটা কত সত্য! ছোটবেলাটাই বুঝিয়ে দিয়েছে, পরের দিনগুলো কেমন হবে। পরে, তিনি বার বার অনুভব করেছেন—"জীবনের যে জানালাটাই খোলা আকাশের দিকে, উধাও বাতাসের নির্বাধ পাগলামির দিকে, ধুতরো ফুলের উড়ে যাওয়া রেণুর মত সোনালী রোদ্দুরের দিকে মুখ করে খুলে যেতে চেয়েছে, তার প্রত্যেকটারই উপর ভারী চিকের পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে—আর যতবার তা সরিয়ে বের হতে চেয়েছি ততবারই কর্কশ ধমকের আওয়াজ আমার শিরদাঁড়ায় যেন হাতুড়ির ঘা মেরেছে।"

চারতলার উঁচু ছাদে উঠে পাঁচিলের ফোকরে পা দিয়ে দূরের সবুজ ঘাসে ঘেরা নির্জন গোরস্থান দেখতে ভালো লাগত বালিকাটির। একদিন ধরা পড়ে গেল 'ছাদে ওঠা' নামক নিষিদ্ধ কাজটি—পিঠে পড়ল চড়চাপড়। কিন্তু সেই কবরস্থানের ছবি ঢুকে গেল বুকের গভীরে। মনে হ'তে লাগল, ঘরের চার-দেওয়ালের আসলে কোনো মানে নেই। অর্থ যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে, তবে সে কেবল এ কবরস্থানের।

এরপরের আশ্রয় চেম্বারলেন রোডের বাড়ি। সে বাড়িতে রান্না করত হয় চাকর, না হয় দাদীমা। আর দাদী কখনো—"আমাকে খুশি মনে পরোটা দিতেন না। গজগজ করতেন—মেয়েছেলের পরোটা খেতে নেই।" বিনা গঞ্জনায় পরোটা-ভক্ষণ—অতটা সৌভাগ্য অজীত স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তবুও বাড়িতে একটা আশ্চর্য ধরনের কাঠকয়লার ঘর ছিল, সেখানে গোছাগোছা কাঠের ছিলকা ছিল, তাতে একটা মৃদু অচেনা গন্ধ ছিল। আর রাত্রিবেলা ছাদে খাটিয়া পেতে শুয়ে আকাশের তারা দেখা ছিল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে

থাকলে মনে হ'ত তারাগুলো যেন আরো নীচে এসেছে। তখন, অজীত ভুলে যেতেন দাদীর যত গজগজানি।

এর পরের বাড়িটা ছিল যাকে বলা যায় মুয়াদের পাশের বাড়ি। মুয়া সেই ছোট্ট, শীর্ণকায়া, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত, হেমন্তের হলুদ ঝরা পাতার মত বিষণ্ণ বালিকাটি, যাকে শীতের সময় সারাদিন ছাদে একা একা শুয়ে থাকতে হ'ত, রাতেও শুতে হ'ত একটি আলাদা ঘরে একা একা। ভয়ের স্বপ্ন দেখে অথবা রোগের যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙলে সাহস দেবার জন্য কেউ কাছে থাকত না তার, অসুখের চিকিৎসাটাও ঠিকমত হয়নি। কারণ প্রথমত ঐ সময়ে যক্ষ্মার চিকিৎসা ছিল ব্যয়সাধ্য এবং একটা মেয়ের জন্য এত টাকা খরচ করা উচিত কিনা—এই দ্বিধা। দ্বিতীয়ত যদি বা অসুখ সারে, তাহলেও ও মেয়ের বিয়ে সহজে দেওয়া যাবে না—প্রচুর 'দহেজ' লাগবে। তাই মুয়ার বাবা-মা অনেক হিসেব কষে তাঁদের পাঁচ সন্তানের একটিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিলেন। নিরাপত্তা দেবে, বেঁচে থাকতে দেবে, এমন নিরাপদ আশ্রয়, এমন Home sweet home, অনেক মেয়েরই কপালে জোটে না। অজীতের দুর্ভাগ্য যে, জীবনের এইসব জটিলতা বালিকা বয়সেই তিনি জেনে ফেলেছিলেন। নিজের বাড়িটা যে আসলে নিজের নয়, তাও বুঝেছিলেন, যখন মুয়ার জন্য চোখের জল ফেলতে তাঁর ভয় হত। অসহায় আর নিরুপায় মানুষ যখন পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, তখন তার কেমন লাগে, সে কথা ভেবেই চাপা কান্নায় বালিকার মন অস্থির হ'য়ে উঠত—সেকথা কাউকে বলতেও পারেননি। কারণ শ্রোতা ছিল না। তাঁর মনের Wave-length বাড়ির কারোর সঙ্গে মিলত না। তাই এটা ঠিক বাড়ি নয়, একটা মাথা গোঁজার জায়গামাত্র হ'য়ে উঠেছিল।

অজীতের ভাই যশবীর ছিল বাবা-মার প্রিয়তম সন্তান। গ্রীষ্মকালে তার মুখে কোনো খাবার রুচত না। তাই প্রত্যেক গ্রীষ্মে অজীতরা সপরিবারে পাহাড়ে যেতেন। কাশ্মীরের সেই পাহাড়গুলোর পাকদণ্ডি পথে ঘুরতে ঘুরতে অজীতের প্রায়ই মনে হত—"...এইখানেই আমার বাড়ি, এখানেই কোথাও এই স্বচ্ছ, ঝকঝকে নদীজলের ধারে কোনো গাছের ঘন ছায়ার নিচে কিম্বা বিশাল গাছগুলোর কোনো একটা কোটরে আমার বাড়িটি ছিল।" পরে বারবার পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল-মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে, যে, এখানেই তাঁর ঘর ছিল। অথচ সে ঘর তিনি খুঁজতে শুরু করলেন ইঁট পাথরের কামরায়। তাই সেখানে পাখির নরম রোঁয়াঢাকা বুকের উষ্ণতা রইল না, মৃদু নিঃশ্বাসে কেঁপে ওঠা সেই পাখিটিও রইল না।

৪

লাহোরের বাড়িতে অজীত নিজের জন্য একটি পড়ার ঘর পেয়েছিলেন। ঘরটার দৈর্ঘ্য প্রস্থের হিসেব এইরকম—এদিকে চার লাফ আর ওদিকে চার লাফ। ঘরের দেওয়ালসজ্জা হয়েছিল একটি মাটির মাছ ও দুটো রঙিন পুঁতির মালা ঝুলিয়ে। ঘরটার পাশে ব্যালকনি, আর তার দরজায় ঝোলানো ছিল মোটা চিক, চিক তুলে রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া তথা গতিশীল জগৎ দেখার হুকুম ছিল না—অথচ দেখার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তাই চিকের ওপর এমনভাবে গাল চেপে ধরে দেখতেন যে গালে কাঠির দাগ বসে যেত। এ ঘরে অবশ্য

ইচ্ছেমত জিনিস রাখা চলত না, শুধু অনুমোদিত জিনিসই রাখা চলত। টিফিনের পয়সা জমিয়ে একটা শখের লকেট কিনেও সেটাকে ঐঘরে রাখা যায়নি, লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল কয়লার ঘরে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর যখন পাকিস্তান গড়ে উঠল, তখন এই ছোট্টো একান্ত নিজের ঘরটিও পাকিস্তান হ'য়ে গেল। চলে আসতে হ'ল হিন্দুস্থানে। আশ্রয় জুটল জলন্ধরের খিড়কিবালি হাভেলিতে। সে বাড়ির আসল মালিকদের নাকি দেশভাগের আগেই কেটে ফেলা হয়েছিল। সেইসব অশরীরী আত্মাদের কান্না শোনা যেত অন্ধকারের ঘরগুলোয়। অজীতও কাঁদতেন তাঁদের সঙ্গে। একসময়ে, এই ভিতরের কুঠরিটায় একা-একা কান্নাকাটির পালা শেষ ক'রে চলে যেতে হল সিমলায়। সেখান থেকে দিল্লীতে দেবনগর খালের ধারের একটা বাড়িতে। ইতিমধ্যে অজীত বড় হয়েছেন আর বিজ্জী (মা) সর্বদা তাকে চোখে চোখে রাখছেন, স্থিরভাবে নজর রেখে যাওয়া সেই দৃষ্টি যেন ওয়েল্ডিং টর্চের মতো শক্তিশালী। নবলব্ধ বন্ধু দীশ্-এর কাছে মানসিক আশ্রয় পেতে চাইতেন। এই পর্যায়ে এক অচেনা মহিলার কাছে একদিন কড়া ধমক খেলেন অজীত—"এই মেয়েরা! তোমাদের নিজেদের বাড়িতে জায়গা নেই গল্প করার? যাও বাড়ি যাও।" সত্যিই কোনো জায়গা ছিল না। এমনকি অজীতের অনুভূতিতে কোনো নিজের বাড়িও ছিল না। দিল্লীর প্যাটেলনগরে গড়ে ওঠা নতুন বাড়িটাকেও অজীত আপন করতে পারলেন না, কারণ দুমাস পরেই তাঁর বিয়ে হ'য়ে গেল।

অজীত চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি করনাল-এ। এবারে একটা নতুন জীবন শুরু হবার সম্ভাবনা ছিল। মাকড়সার জাল, গমের স্তূপ, আর লেপ তোশকের তুলো ডাঁই ক'রে রাখা একটা ঘরে নতুন জীবনের প্রথম রাত কাটাতে গিয়েই অজীত জানতে পারলেন, স্বামীর জীবনে অন্য নারী আছেন। ক্রমশ দেখা গেল স্বামী কঠোরহৃদয়, শাশুড়ি ছিদ্রান্বেষণকারিণী। শাক-সবজি-তেল-নুন-দেশলাই-এর চুলচেরা হিসেব দিতে হ'ত স্বামীকে, একটু বেশী খরচা হলেই তিনি চেঁচাতেন—"এ কি হারামের পয়সা পেয়েছিস? তোর বাপের পয়সা খরচ করছিস।" অজীত কাঁদতেন আর ভাবতেন, এই কি তাঁর নিজের সংসার!

প্রতি পাঁচ ছ'মাস অন্তর স্বামী রাগ ক'রে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে পঠিয়ে দিতেন শ্বশুরবাড়ি। আবার কিছুদিন বাদে তাঁদের ফিরে যেতে হ'ত। অজীত যেন ছিলেন একটা ফুটবল, যে যেদিকে লাথি মারত সেদিকেই গড়াতেন। বাপের বাড়ি যাবার এবং আসবার সময়ে কেউ একটা ভালো কথা বলত না। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মা ও দুই মেয়ের মধ্যকার পরস্পর নির্ভরশীল ভালবাসা। সেই ভালবাসার জোরেই একদিন দু মেয়েকে নিয়ে অজীত চলে গেলেন ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে। অতি গরীবানাভাবে তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হল। তবু সেই নিজের ঘরে ইচ্ছেমত ঘুমানো যেত, ইচ্ছেমত রাত অবধি আলো জ্বালানো যেত। এরপর আরো কয়েকবার বাড়ি বদল ঘটেছে তাঁদের, তার প্রত্যেকটাই অন্তত কিছুদিনের জন্য নিজের ঘর হত। কাহিনী এমন জায়গায় এসে থেমেছে যে, বর্তমান বাসস্থানে থাকার মেয়াদ ১৯৯৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত, আর তারপর কোথায় যাবেন, জানা নেই। অজীতের মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যেন বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে স্টেশনেই বসে

আছেন সর্বদা। ঘরের মধ্যে থেকেই যাযাবরী স্বাদ পান বারে বারে—আর এই পুনরাবৃত্তি তো তাঁর বহুদিনের অভ্যাস! জিপ্সি বংশে জন্ম না হ'লেও, জীবন তাঁকে জিপ্সি বানিয়ে তুলেছে।

৫

"তারপর থেকে রাস্তাই যেন আমার বাড়ি হ'য়ে দাঁড়াল। সকালে চোখ মেলার মুহূর্ত থেকেই তৈরি হ'বার তাড়াহুড়ো লেগে যেত। ...ধাক্কা আর গুঁতো খেতে খেতে বাসে করে দিল্লী ইউনিভারসিটি। বিকেলে টলতে টলতে ফিরতাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বিজ্জীর কাছে। ডলিকে দেখতে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আবার এখানে—স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে।

রাত্রি একটায় অবশ শরীরটাকে নিয়ে কোনোমতে যেন বিছানাটাতে আছড়ে পড়তাম সেই কি ছিল আমার 'নিজের ঘর'?"

আলোচ্য গল্পের অংশবিশেষ এটি। 'তারপর' বলতে অজীত কৌর যে খুব উল্লেখযোগ্য কিছুর পরে বুঝিয়েছেন এমন নয়। উদ্ধৃত অংশে যা যা ঘটেছে, তারই নানা রকমফের আগেও বারে বারে তাঁর জীবনকে স্পর্শ করে গেছে, তবু একটা কথা এখান থেকে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—মানুষ সম্পূর্ণ নিজের একটা ঘরসংসার চায়, শত কষ্টেও তার এ চাহিদা মরে না। এই চাহিদার দিক থেকে অজীত যেমন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, তেমনি মোহনও। 'আশ্রয়' উপন্যাসের মোহনকে বারে বারে বৃত্তিবদল করতে হয়েছে আশ্রয়ের সন্ধানে। তার জীবনে 'আজো' শব্দটির অসীম গুরুত্ব, এজন্যই বারে বারে সে বিদ্রোহ করেছে। বোনের বিয়ের জন্য টাকা ধার চাওয়াতে মালিক যখন তাকে আশ্রয় দেবার কথা বলে এবং সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পলায়নকারী ব'লে উল্লেখ করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, তখন মোহনের পক্ষে এটাই যথার্থ উত্তর হয় যে "আমরা সিন্ধু থেকে পালিয়ে এসেছি, সেটা কৌতুকের নয়।"

দ্বিতীয়বারের ঘটনাস্থল মুম্বইয়ের নিকটবর্তী উল্লাসনগরের কল্যাণক্যাম্প। এখানে সে তার কাকা মেঘরাজের কাঠের গুমটিতে বসে বিড়ি বাঁধত। মেঘরাজ ছিলেন এককালের শরণার্থী, কিন্তু নানা আচরণ ও অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি এদেশকে নিজের ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। আগে তাঁর অভ্যাস ছিল আটার গুলি বানিয়ে মাছদের খাওয়ানো, এদেশেও তিনি সে কাজ নিয়মিত করতেন—আর অবাক হ'য়ে দেখতেন যে কত বিচিত্র রকমের মাছ আছে! তিনি ছিলেন খাজা খিজর্ বা নদীর দেবতার উপাসক, তাই নদীর কন্যা মাছেদেরও বড় ভালবাসতেন। মেঘরাজের এই জীবনাচরণ মোহনের পছন্দের সঙ্গে খুব মিলে যায়—তাই মোহনও কিছুদিন মনের সুখে বাস করতে পারে। কিন্তু দুই চোলাই মদওয়ালা জায়গাদখলের বাসনায় কাকা মেঘরাজকে জলে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। এই অপ্রমাণিত হত্যার বিরুদ্ধে একা মোহন তেমন কিছুই ক'রে উঠতে পারে না। তবু চেষ্টা করে। আসলে তাদের অতীত জীবন ও বর্তমান জীবনের মধ্যে ইতিহাস যে ফাঁকটা গড়ে দিয়েছে, মোহনের চেষ্টা থাকে সেটা অতিক্রম করবার। ইতিহাসের দায়কে সে ব্যক্তিমানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়। ফলে সে শেষপর্যন্ত সহানুভূতিপ্রবণ দারোগা এবং উকিল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বহু পরিশ্রমের পর ঐ দোষীরা ধরা পড়ে। কিন্তু শুধুমাত্র চোলাই মদ বিক্রির জন্যই তাদের

শাস্তি হয়—সন্দেহের অবকাশে খুনের মামলা থেকে তারা ছাড়া পেয়ে যায়।

তৃতীয়ত, প্রেমিকা শোভার বাবা যখন তাকে আশ্রয় হিসেবে একটি ফ্ল্যাট দিতে চান, তখনই মনে হয়, সে যেন ভাবী শ্বশুরের সামনে শুধুমাত্র একটি আশ্রয়হীন অস্তিত্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটি তার মনের এক স্পর্শকাতর স্থান—সিন্ধুদেশ তাদের নয়, ভারতও তাদের নয়—তারা তবে কোথাকার! শ্রম দিয়ে মানুষ ভূমিকে আপন ক'রে নেয়, অথচ এখানে শ্রমের মূল্যেও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। চতুর্থ দফায় মুম্বইতে যখন একই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটল, তখন সে বুঝে গেছে আশ্রয় তাকে গড়ে নিতে হবে।

এক্ষেত্রে আরো একটি স্পর্শকাতর বিষয় আছে। সেটি ভাষাগত। সিন্ধি যদিও ভারতীয় সংবিধানের তপশিলে একটি স্বীকৃত ভাষা, কিন্তু ভারত ইউনিয়নে "সিন্ধ' নামে কোনো জায়গা নেই। একটা ভাষার যদি অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে সীমায়িত কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্র থাকে, তবে সেখানে দাঁড়িয়ে সেই ভাষা তার শব্দ / ধাতুরূপ, উচ্চারণ, অর্থের বিস্তার ও সঙ্কোচন—তার স্বকীয় ব্যবহার—এগুলিকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু সিন্ধিভাষা সেই দাঁড়াবার জমিটাকেই হারিয়েছে। ফলত অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ভারতে বসবাসকারী অনেক সিন্ধিভাষী একথা ব'লে থাকেন যে, যদিও বাড়িতে থাকলে, সিন্ধি বলাতেই তাঁদের ফূর্তি কিন্তু কোন কথার কি ঝোঁক, সেটা আর তাঁদের জানা নেই। প্রসঙ্গত এও উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় কারেন্সি নোটের উপর সিন্ধিভাষায় নোটটির মূল্যমান লেখা থাকে না। ভাষাকে হারিয়ে ফেলাও একধরনের আশ্রয়হীনতা। মোহন সেই অবস্থাটাকেই জয় করতে চেয়েছে, চেয়েছে 'আজো' শব্দটিকে তার যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে। দেশভাগের পর এই শব্দটির সঙ্গে লেগে গেছিল 'গলগ্রহ' বা 'আপদ'-এর মত রূঢ় অর্থ। সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে মোহন।

৬

অজীত এর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে উচ্চারিত একটি শব্দের পুনঃপুনঃ আঘাত হয়তো নেই—কিন্তু অন্যবিধ বাক্যের চাবুক যথেষ্টই আছে। কখনো সে চাবুকের আঘাত মৃদু ; যেমন যখন মা ধমকে বলতেন—"হাঁ করে অন্যের ঘরের ভিতরের দিকে ওরকম তাকিয়ে থাকে না" ; আবার কখনো তা অতীব রূঢ়, বিশেষত যখন শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই পাঁচ সাতজন প্রতিবেশিনীর অস্ফুট ফিসফিসানি শুনলেন—"আরে ওর থেকে তো দশগুণ সুন্দরী এ"—এবং রাতেই স্বামী সেই তুলনামূলকভাবে কম সুন্দরীর ছবি দেখিয়ে, নিজের সঙ্গে তার হৃদয়ের সম্পর্কের কথা ব'লে নববিবাহিতা স্ত্রীকে জানালেন—"তুমি তো শুনতেই পাবে। তাই বরং বলে দেওয়াই ভালো।" এসব কথায় অজীত কিন্তু মোহনের মতো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। তিনি মুখে কিছু বলেননি, বারে বারে ভেবেছিলেন যে একনিষ্ঠতার তপস্যা দিয়ে এই বিমুখ হৃদয়টি জয় করে নেবেন। পারেননি। বারে বারে নানা কারণে স্বামীর ধমক খেয়েছেন—"এত রাত অবধি আলো জ্বালা কেন? ইলেকট্রিক বিল কি তোর বাপ এসে দেবে?" তাঁর আত্মজীবনীর অন্য অংশটি, যা "শামুক আর সমুদ্র" গল্পে আছে, সেখানে অজীত জানাচ্ছেন, যে, তাঁর কঠোর, আতঙ্কজনক, শোকময় বিলাপে ভরা বিয়ের পর বারো বছর কেটে গেছে ; এবং এই বারো বছরে যখনি তিনি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

নেওয়ার কথা ভাবতেন, তখনি স্বামী ভয় দেখাতেন যে বাচ্চা দুটিকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবেন, আর বলতেন—"এ দুটোকে সিঙ্গাপুরে কোঠিওয়ালীদের কাছে বেচে দেব।" একবার মাত্র অজীত চিৎকার ক'রে এ কথার উত্তর দিয়েছিলেন—"সিঙ্গাপুরেই কেন? এখানেই কেন নয়? এই দিল্লীতেই? তাহ'লে মাঝে মাঝে নিজেও যেতে পারবে!"—অমনি এক ঝটকায় নরকের সব ক'টা দরজা খুলে গিয়ে তুমুল তাণ্ডব শুরু হ'য়ে গেছিল। (আলোচ্য গল্পে এ অংশটির আভাসমাত্র আছে।) এই প্রথম অজীত আর না ফেরার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বামীর ঘরের চৌকাঠ পার হ'য়ে গেলেন। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের একটা ঘরে এক গরীব মা তার দুই বাচ্চাকে নিয়ে (বহুকষ্টে অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল এদের সঙ্গে রাখবার) সংসার পাতলেন। সেখানে দুজনের খাবার তিনজনে খেতেন ; একটামাত্র লেপ দুই মেয়েকে দিয়ে মা সতরঞ্চি গায়ে সারারাত ঠকঠক ক'রে কাঁপতেন। তবুও আগের তুলনামূলকভাবে সচ্ছল জীবনের চেয়ে এ জীবনটাই ছিল গর্বের, কারণ "যখন ইচ্ছে শুয়ে থাকো কি ঘুমোও, যখন ইচ্ছে জাগো, যখন খুশি পড়। কেউ ধমকাবার নেই,...এখন প্রাণ ভরে ঝলমলে আলো লাগাও।"

অজীত যেমন তাঁর নিজের ঘর গড়ে নিলেন, মোহনও যে তা গড়ে নিতে চলেছে, এমন ইঙ্গিত এ কাহিনীর মধ্যে আছে। ঘর তৈরী করতে প্রথমে লাগে determination, তারপরে আসে ইঁট-কাঠ-বালি-সিমেন্ট-শ্রমের পালা। মোহনের ক্ষেত্রে সেই আশ্রয়নির্মাণের আভাস র'য়ে গেছে। তাঁরা শুধুই বাড়ি বা 'মকান' বানাতে চাননি—চেয়েছিলেন নিজেদের গৃহ বা সংসার।

৭

অজীতের কাহিনীর শেষ হয়েছে অন্যভাবে। এতোদিনে তাঁর নিজের কাছে আশ্রয়ের ধারণা স্পষ্ট হ'য়ে গেছে—এখন শুধু বারে বারে সেই আশ্রয় খুঁজে বার করবার অনলস অনুসন্ধান তাঁর। যে কাহিনী এইভাবে শেষ হয়—"অবশেষে সকলে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল"—সে কাহিনী অজীতের নয়। সুখশান্তির ঘর তো হ'ল, এখন তাকে টিকিয়ে রাখার সমস্যাও তাঁর। আশ্রয়কে রক্ষা করা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া। শুধুমাত্র যথেষ্ট অর্থ থাকলেই এ কাজ হয় না। অজীত আশ্রয় বলতে আরো অনেককিছুকে বুঝতেন। খোলামেলা, আলোবাতাসে ভরা ঘর, চারদিকে সবুজের ছোঁওয়া, পরিশীলিত মনের প্রতিবেশীর সান্নিধ্য—এসবই তাঁর বেঁচে থাকার জন্য দরকার। কিন্তু এগুলি তো নিরন্তর পরিবর্তনশীল, অতএব জীবনের দ্বিতীয়ভাগেও বারে বারে তাঁর আশ্রয়বদল ঘটেছে। ঘন ঘন এক ভাড়াবাড়ি থেকে আর এক ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হ'তে হ'তে তিনি ক্রমশ নিজের মধ্যে একটা শ্রেণীগত পরিবর্তনও অনুভব করেছেন। তিনি যেন 'ঘর বাঁধতে চাওয়া' মানুষ থেকে ক্রমশ যাযাবর বা জিপ্‌সি হ'য়ে গেছেন। ঘর হ'য়ে গেছে তাঁবু, সময় হ'য়ে উঠেছে তাঁবু তোলা আর ফেলার যোগফল!

৮

সুন্দর ক'রে বেঁচে থাকা তথা জীবনটাকেই সুন্দর ক'রে সাজানো বিষয়ে অজীতের

ধারণাটা উদ্ধৃতিযোগ্য—"এই বাড়িটা খুব খোলামেলা। একটা ঘর থেকে পরপর চারটে ঘরেই যাওয়া আসা করে, খোলামেলা কিচেনে সাজিয়ে রাখা সুন্দর বাসনে রান্না করে, মালিকে দিয়ে লনে ক্যালকাটা গ্রাসের বীজ লাগিয়ে, ড্রইংরুমের জন্য রবি সিক্‌রি থেকে সুইডিস ডিজাইনের সোফাসেট আর ঘাস রঙের কার্পেট পছন্দ করে আনিয়ে, নিজের লেখার জন্য আলাদা টেবিল তৈরি করিয়ে আর শ' শ' পাওয়ারের বাল্ব লাগানো ঘরে চলাফেরা করে মনে হতে লাগল আমি আমার সমস্ত জীবনটাকেই আবার নতুন করে সাজাচ্ছি।" এই সাজানো বাড়িতে বেশিদিন থাকা হয় না অজীতের—তাঁর যাযাবর ভাগ্য তাঁকে আবার পথে ঠেলে। বহু বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করেন তিনি, তাঁদের বহু সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্নের জবাব দেন, যথা, বাড়িতে কে কে থাকবেন, হাজব্যান্ড কোথায় এবং কি করেন, বাবা ও ভাই কি করেন, কেন তাঁদের কাছে থাকেন না, আপনি কি কাজ করেন, কীভাবে নিয়মিত ভাড়া দেবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অভিমন্যুর মত বিক্রমে সব প্রশ্নশর সহ্য করেন তিনি, তবু বাড়ি পান না। যদি বা পান, সেখানে বেশীদিন থাকতে পারেন না—লাল-নীল-ছাপা নাইলন শাড়ি পরা বাড়িওয়ালী-র অবিরাম কাংস্যবিনিন্দিত বকবকানি সহ্য ক'রেও থাকার ব্যাপারে কোনো স্থায়ী সুরাহা হয় না। অজীতের এই কাহিনী শেষ হয়েছে সেই আশ্রয়হীনতার ইঙ্গিত দিয়ে।

৯

লাঞ্ছনা ভোগ করার ব্যাপারে মোহন ও অজীত একই সমতলে আছেন। সিন্ধুপ্রদেশ থেকে পালিয়ে আসার জন্য যে অপমান সিন্ধিরা সয়েছেন, মোহন তার প্রতিবাদ করেছিল, বারে বারে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল, 'পরদিন খাবার জুটবে না' জেনেও। এ ব্যাপারে সে একা, আর কোনো সিন্ধিমানুষ এ নিয়ে তত মাথা ঘামাননি। ইতিহাসের দায় কেউ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেননি, যা মোহনকে একাই করতে হয়েছিল। আশ্রয় গড়ে নেবার জন্যও, বহুদিন পর্যন্ত তার চেষ্টা ছিল একক। সে যে একজন ভালো বিড়িশ্রমিক, নিজের কাজটুকু ভালোভাবে করবার পর অর্জিত হয় যে আত্মকর্তৃত্ব, একমাত্র সেটাই মোহনের বিশ্বস্ত সঙ্গী হ'য়ে থেকেছে। অজীতের সঙ্গে ছিল তাঁর কয়েকজন বন্ধুর হিতৈষণা এবং স্বামীর বাড়িতে থাকতে থাকতে তিনি অত্যাচার সহ্য করার যে অভ্যাস রপ্ত ক'রে ফেলেছিলেন, সেটাও তাঁর সঙ্গী ছিল, তবু তাঁর আশ্রয় অনুসন্ধানটাও আসলে একক। বরং তাঁর ক্ষেত্রে কিছুটা মনোকষ্টও ছিল—কারণ তাঁর বাবা আছেন, ভাই আছেন—সকলেই প্রতিষ্ঠিত—অথচ কারোর কাছে আশ্রয় নেই, এমনকি তাঁর ভাবনাচিন্তার যথার্থ শরিকও কেউ নন। তিনি সঙ্গীর মধ্যে একা। ইতিহাসের কোনো দায় তাঁর কাঁধে নেই বটে, কিন্তু সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে, দায়িত্বশীল মা হিসেবে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার দায় আছে। এ দায় পালন করতে গিয়ে অজীতের লড়াই শুরু হয়েছে আপন-পর সবার সঙ্গেই। মোহনকে যুঝতে হয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে। এ মানুষদুটির সমাজপরিবেশ, জীবনযাপনের ধাঁচ, বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা—এগুলোর মধ্যে মিল নেই—কিন্তু যেমন-তেমন ক'রে মাথা গুঁজে থাকার ব্যাপারে অনীহা-ই উভয়ের মধ্যে সাম্য গড়ে দিয়েছে।

মানুষের জীবন কতকগুলি সাফল্য আর ব্যর্থতার আলো-আঁধারির সমীকরণ। কাহিনীশেষে মোহন পা রেখেছে তার জীবনের আলোর দরজায়, আর অজীত ক্রমশ ভেসে যাচ্ছেন ব্যর্থতার দিকে। আশ্রয়ের সন্ধান দুটি মানুষকে দুই ভিন্নভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থ তালিকা :

১. জিপসি নদীর ধারা—অজীত কৌর (জয়া মিত্র কর্তৃক বাংলায় অনূদিত)
২. আশ্রয়—হরি মোটোয়ানি (দেবেশ রায় কর্তৃক বাংলায় অনূদিত)

Indian Institute of Advanced Study
111853
11/8/03
SHIMLA